আজও পুকুর আমাদের

অনুপম মিশ্র

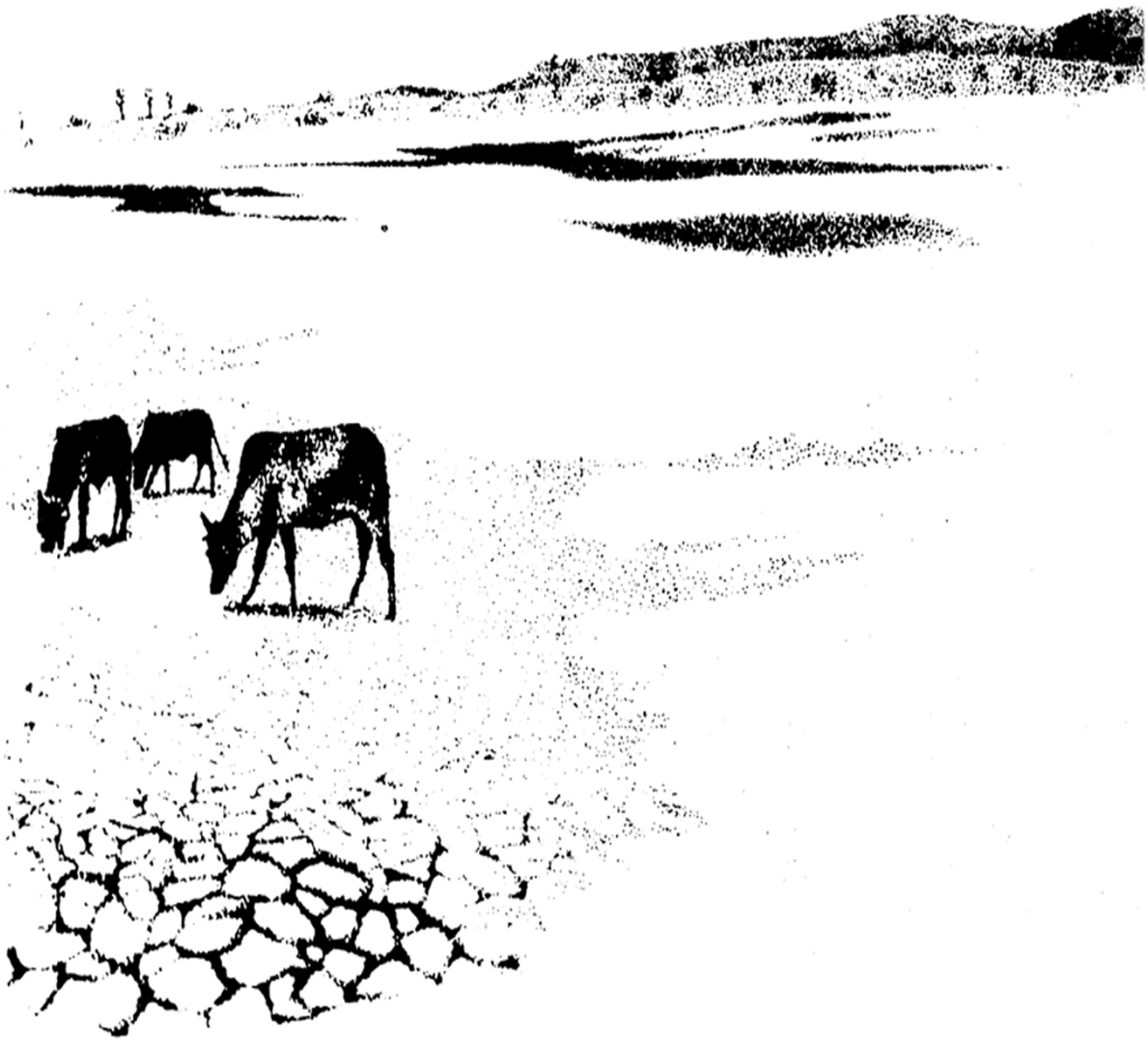

আজও পুকুর আমাদের

অনুপম মিশ্র

অনুবাদ
নিরুপমা অধিকারী

আশাবরী

ĀJ0 PUKUR ĀMĀDER

A Bengali Translation of

'ĀJ VI KHARE HAIN TĀLĀB' originally written in Hindi.

গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ বিভাগ কর্তৃক হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত

বই 'আজ ভি খরে হ্যায় তালাব'- এর বাংলা অনুবাদ ।

গবেষণা ও সহযোগিতা : শীনা, মঞ্জুশ্রী

প্রচ্ছদ : রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচিপত্র অঙ্কন : পাঁচুগোপাল দত্ত

অলঙ্করণ : দিলীপ চিঞ্চলকর

গ্রন্থসত্ত্ব : সঞ্জয় অধিকারী

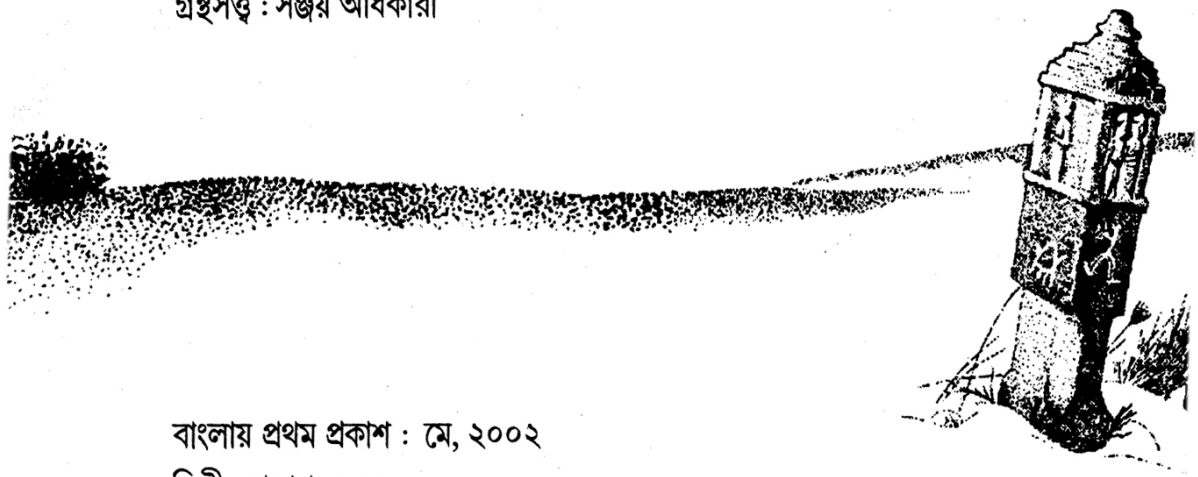

বাংলায় প্রথম প্রকাশ : মে, ২০০২

দ্বিতীয় প্রকাশ : জুন, ২০০৫

প্রকাশক : আশাবরী। নেতাজী সুভাষ রোড। পুরুলিয়া - ৭২৩১০২। পশ্চিমবঙ্গ।

আলাপন - (০৩২৫২) ২২৬৮৪৮ / Netajee Subhus Road. Purulia -723102.

(W..B). Dial - (03252) 226848

অক্ষর বিন্যাস, মুদ্রণ ও তত্ত্বাবধান : আশাবরী।

মুদ্রক : ডি এন্ড পি গ্রাফিক্স প্রাঃ লিঃ, গঙ্গানগর, উত্তর ২৪পরগনা, কলি - ১৩২।

মূল্য: ৬০টাকা

উৎসর্গ

আমাদের শ্যাম'দা কে-

প্র স্তা ব না

ছয় দশক আগে বিদেশ থেকে এখানে এসে এক বিশ্ববিখ্যাত ভৌগলিক রেলগাড়িতে দেশ ভ্রমনে ভারতের ভূমি প্রকৃতি ও তার ব্যবহার স্বচক্ষে দেখে অবাক হয়ে বলেছিলেন, এদেশের মানুষ জল সংরক্ষন ও তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কত বৈচিত্রময় করে তুলেছে। মৌসুমী বৃষ্টির জল সযত্নে ধরে রেখে সারা বছর ব্যবহারের কত সযত্ন প্রয়াস। প্রশ্ন করেছিলেন, এই অভিজ্ঞতাকে কি কাজে লাগানো যায় না? ষাট বছর পর এখন কথা উঠছে, বড়বড় জলসেচ প্রকল্পর উপর নির্ভরশীলতার বাইরে আমাদের ছোট বড় জলাধারগুলিকে জল সংরক্ষণের কাজে লাগাতে পারলে অতি অল্প ব্যয়ে স্থানীয় ভাবে তৃষ্ণা ও সেচের চাহিদা মেটানো সম্ভব, তাই সেদিকে নজর দিতে হবে।

নদীমাতৃক পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সর্বত্র পুকুরকে এভাবেই দেখা হয়েছে। রাজরাজড়া, জমিদার থেকে শুরু করে রায়ত কৃষক যাদের ছিটেফোঁটাও জমি ছিলো—সকলেই চাষের সঙ্গে জলের সংস্থানের কথা ভেবে পুকুর, দীঘি কাটিয়েছে, মরা বা পরিত্যক্ত নদীখাতে বাঁধ দিয়ে জলাধার সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে দাক্ষিণাত্যের প্রায় সর্বত্র বহুশত বছর ধরে অপেক্ষাকৃত নিচু বর্তুলাকার জমির একদিকে বাঁধ দিয়ে জলধারণ ব্যবস্থাকেই বলা হয় ঐতিহ্যবাহী দীঘির জল ধরে সেচের আয়োজন।

আমাদের দেশে তৃষ্ণা মেটাতে বা সেচের জল সরবরাহ করতে ছোট বড় জলাধার নিয়ে বির্তক এখানে অপ্রাসঙ্গিক। প্রাসঙ্গিক শুধু আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে প্রাচীন অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষার সংমিশ্রণে প্রকৃতির সঙ্গে সমন্বয় সাধন করার প্রয়াসকে উপেক্ষা না করে, স্বাগত জানানো। এতে কোন ক্ষতিতো নেই-ই, বরং ছোট ছোট প্রত্যন্ত অঞ্চলের চাহিদা মেটানোর এ এক অতি সহজ পদ্ধতি।

'আজও পুকুর আমাদের'- এই বইটির মূল রচনা হিন্দীতে, লেখক অনুপম মিশ্র। প্রকাশক *গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠান।* লেখক মূল বইয়ের নাম দিয়েছিলেন **'আজ ভি খরে হ্যায় তালাব'**। তাকে সামান্য বদল করে যে বাংলা শিরোনাম দিয়েছেন তাতেও বইটির সঠিক বক্তব্য পরিস্ফুট হয়েছে। নয়টি পরিচ্ছেদের নামও বাছা হয়েছে অতি স্বযত্নে যাতে আমাদের জীবনে, সাদামাটা সংসারে পুকুরের অবদান ধরা পড়ে, পুকুরের ধারে গড়ে ওঠা গ্রাম সমাজে তার রক্তের বাঁধন ভুলে না যাই।

পুরুলিয়ার নিরুপমা অধিকারীর সঙ্গে বইটির প্রসঙ্গে যখন পরিচয় হয় তখনই জল নিয়ে তাঁর আন্তরিক উৎসাহ আমাকে নাড়া দিয়েছিলো। আজ সেই জলের সন্ধানে তাঁর 'পুকুর আবিষ্কার' রীতিমত মুগ্ধ করেছে। ভূগোল চর্চা করতে গিয়ে জলের ব্যবহার, অপব্যবহার নিয়ে অনেক কথা বলেছি, পড়েছি, লিখেওছি। স্বাধীনতা পরবর্তী সেই যুগে তরুণ বয়সে এ রাজ্যের বহুমুখী নদী পরিকল্পনাগুলি প্রায় পদব্রজে ঘুরে খুঁটিয়ে দেখে মনে হয়েছে, গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না - এই কথাটি কত ঠিক। আমাদের চিরকালের পুকুর ও দীঘি-দহগুলি হেজে মজে সংস্কারের অভাবে নষ্ট হয়ে গেল। আর আমরা ছুটেছি টেনেসি নদীর মডেলের দিকে। একথা কেউ বলে না যে বিদেশী মডেল মানেই খারাপ, অথবা তা থেকে শেখার কিছু নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের নিজস্ব হাজার হাজার পুকুরকে কেন ভুলে যাব? এখন বলা হচ্ছে বর্ষার অতিরিক্ত জল ধারণের জন্য বিশাল বড় বড় জলাধার যথেষ্ট নয়, বরং পলি জমে দিন দিন তাদের ক্ষমতা খর্ব হয়ে যাওয়ায় বর্ষাকালে বানের বিপদ তারা বৃদ্ধি করে। পশ্চিমবঙ্গে আধ ডজন এমন জলাধারের রক্ষণাবেক্ষণ করাই যেখানে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে নতুনের কথা ভাবাও দুরূহ।

মাঝে মনে হয়েছিলো আমাদের রাজ্যে ভৌম জলের প্রাচুর্য, তার ব্যবহারে আমাদের তৃষ্ণা মিটবে। এখন দেখা যাচ্ছে অতি ব্যবহারে সেই ভাণ্ডারেও টান পড়েছে, জল গরল হয়ে উঠে আসছে কোনও কোনও জায়গায়। তাই বিশ্বস্ত সেই 'পুরাতন ভৃত্য'কে স্মরণ করতেই হচ্ছে। নিরুপমা অধিকারী একটি চিঠিতে আমাকে লিখেছিলেন, 'এই বইটি সমাজের সেই হৃদয়কে, জলের ওপরে আধারিত সেই জীবন দর্শনকে বোঝার ও বোঝানোর একটি প্রয়াস, যে হৃদয় দেশের এই কোনা থেকে ঐ কোনা পর্যন্ত নিজেদের শক্তি ও সম্পত্তি দিয়ে তৈরী করত পুকুর।'

নিরুপমা বলছিলেন, কারা করত এই পুকুর, কারা করাতো এই পুকুর, কিভাবে করত, কত প্রকারের হত - এই কথাগুলি বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে বইটিতে। চেষ্টা করা হয়েছে জলের অভাবে বর্ষার বাইরের দিনগুলিতে দুর্দশার পরিক্রমাটিকেও বুঝে নেবার। ঘোরতর উপেক্ষার মধ্যে আজও পুকুর আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ গ্রাম ও হাজার হাজার শহরকে বরুণ দেবের প্রসাদ বিতরণ করে চলেছে।

জল ও পরিবেশ-প্রেমীদের বইটি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সুনীল কুমার মুন্সী

একটি পুকুরের কাহিনী

একটি পুকুরের কাহিনী আবার একটি না-পুকুরেরও কাহিনী। একটি মেয়ের জীবন কাহিনীতে আকৃষ্ট হয়ে আমি ২০০১-এর ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর গ্রামে যাই। গ্রামের নাম ডাকাকেন্দু, জেলা পুরুলিয়া। এখানে সময়টা উল্লেখযোগ্য, ফেব্রুয়ারী মাস অর্থাৎ চাষী তাঁর সারা বছরের পরিশ্রমের ফসল ঘরে তুলেছেন। এতেই চলবে আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত। কেননা বোরো চাষ পুরুলিয়ায় হয় না বললেই চলে, এই অঞ্চলে তো নয়ই। কিন্তু আগামী ডিসেম্বর তো অনেক দূর, এই ফেব্রুয়ারীতেই ডাকাকেন্দু জনহীন। গ্রাম ছেড়ে চলে গেছেন প্রায় আশি ভাগ মানুষ। ১৯৯৮, ৯৯ ও ২০০০-এর খরায় কারও ঘরে খাবার নেই এক দানাও। পর পর ঘরগুলোতে তালা ঝুলছে। যাঁদের দরজাও নেই তাঁরা দুয়ারে কাঁটা গেঁথে রেখে চলে গেছেন। ঐ জনহীন প্রান্তরে কোথাও বসে রয়েছেন একজন অন্ধ বৃদ্ধ, কোথাও বা পোলিওতে দু-পা অক্ষম হয়ে যাওয়া যুবক। গ্রামে কয়েক ঘর চাকুরিজীবি রয়েছেন। আর ওরই মধ্যে যাদের একটু চাষ হয়েছে তাঁদেরই ভরসায় এই পঙ্গু মানুষগুলোকে ফেলে সকলে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছেন কাজের সন্ধানে। সাধারন ভাবেই পুরুলিয়ার কিছু মানুষ বছরে দুবার (আমন ও বোরো) চাষের কাজে বর্ধমান চলে যান। যখন তাঁরা আমন ধান কাটতে যান, তখন পৌষ সংক্রান্তির আগে গ্রামে ফেরেন। কেননা পুরুলিয়ার গ্রাম্য জীবনে প্রধান উৎসব হলো 'টুসু'। এবার তাঁরা টুসুতেও ফেরেননি। উৎসব হবে কিভাবে! সাধারণ দিনের খাবারই ঘরে নেই।

অদ্ভুত ঘটনা! পাশাপাশি গ্রাম বিজয়ডি। সেখানে কিন্তু দুর্দশা এতদূর গড়ায়নি। কারণ, সেখানে রয়েছে পূর্বপুরুষের একটা বড় পুকুর। ফিরে আসি একটি পুকুর ও দুটি গ্রামের পরিস্থিতির অনুভব নিয়ে। কিছুতেই ভুলতে পারিনা সেই পুকুরটিকে যেটি একটি গ্রামকে জীবন দান করেছে। পুরো ঘটনাটা বলি শ্যাম অবিনাশজীকে। তিনি আমার হাতে দেন অনুপম মিশ্রজীর বই 'আজ ভী খরে হ্যায় তালাব'। এর আগেও তিনি পুরুলিয়ার সাহেব বাঁধ প্রসঙ্গে এই বইটির কথা বলেছিলেন। পড়া হয়ে ওঠেনি। এবার আর অপেক্ষা করি না। পড়ে ফেলি। অভিভূত হই। অনুভব করি বইটির প্রয়োজনীয়তা। আর মনে মনে অনুপমজীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে আওড়াই 'আজও পুকুরই খাঁটি', 'আজও পুকুর আমাদের'।

অনুপমজী তাঁর বইয়ে লিখেই দিয়েছেন, 'এই বইয়ের বিষয়বস্তু যেকোনও ভাবে

ব্যবহার করা যেতে পারে।' তবুও অনুবাদ করার বাসনা জানিয়ে চিঠি লিখি। দ্রুত উত্তর পাই। বই পড়ে অভিভূত হয়েছিলাম, চিঠি পড়ে মুগ্ধ হলাম। অনুপমজী বলেন 'জলের কাজ ভালবাসার কাজ', আর তাঁর এই মনোভাব থেকেই বইটি একটি আন্দোলনের ভূমিকা নিতে পেরেছে। ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় বইটি অনুবাদ তো হয়েইছে, পুকুর সংস্কারের কাজও শুরু হয়েছে বিভিন্ন এলাকায়। বর্তমান জল সমস্যায় অন্যতম উৎকৃষ্ট উপাদান বোধহয় পুকুর-ই। যদিও এখন পুকুর বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে এই দৃশ্য সুলভ, পুকুর খোঁড়া হচ্ছে এই দৃশ্যের তুলনায়। অথচ ভারতে হাজার হাজার বছর এই পুকুরই সমাজের প্রতিটি শ্রেণীর মানুষের প্রয়োজন মিটিয়েছে বৃষ্টির জল ধরে রেখে। ভূগর্ভস্থ জলস্তরও বজায় রেখেছিলো পুকুর-ই। এই ব্যবস্থা ছিলো আমাদের সমাজসিদ্ধ ও স্বয়ংসিদ্ধ। অনুপমজীর বইয়ে এই সমাজের সৌরভ ছড়িয়ে রয়েছে পাতায় পাতায়। ভাষা বৈশিষ্ট্যের বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য।

অনুপমজীর সহৃদয় অকৃপণ সহযোগিতা ছাড়াও এই অনুবাদে সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি অনেকের। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী রামানন্দ বন্দোপাধ্যায়কে অনুরোধ করা মাত্রই এঁকে দিয়েছেন প্রচ্ছদ। খাঁটি সোনায় তৈরী পুকুরের কাহিনীর, খাঁটি সোনায় তৈরী এই প্রচ্ছদ সত্যই এক 'পরশ'। এই প্রাপ্তি আমাদের সকলের। বর্ষীয়ান ভূগোলবিদ্ অধ্যাপক সুনীলকুমার মুন্সী শত ব্যস্ততার মধ্যেও লিখে দিয়েছেন প্রস্তাবনা। সুনীলকুমার মুন্সীর উদারতা ও সহযোগিতা আলাদাভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। পাঁচুগোপাল দত্তের পূন্যি পুকুরের আলপনায় ফোল্ডার তৈরী করিয়ে আমরা অনুবাদের পথচলা শুরু করি। প্রুফ দেখায় সহযোগিতা করেছেন অদ্রীস বিশ্বাস ও সুরজিৎ সুলেখাপুত্র। যোগাযোগ প্রচার ও অনবরত মানসিক উৎসাহ দিয়ে কাজের গতি অব্যাহত রেখেছিলেন সমর বাগচী। বর্ষীয়ান এই মানুষটির সারল্য আমায় মুগ্ধ করেছে। শ্যাম অবিনাশ সম্পর্কে একটি কথাই বলা যায় তিনি ছাড়া এই অনুবাদ আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। এছাড়াও সহযোগিতা করেছেন - সুবোধ বসুরায়, সুনন্দ বন্দোপাধ্যায়, দিলীপ ঘোষ, নির্মল হালদার, রাওয়েল পুষ্প, সুনীল মাহাতো, জয়া মিত্র, মণিদীপা, সীমা বাগ।

অধ্যায়ের শেষে পাদটীকাগুলি মূলবইয়ে নেই। বাঙ্গালী ও বাংলার পাঠকদের সুবিধার্থে এই সংযোজন করা হলো। আপনার এলাকার পুকুরের সঙ্গে যদি এই বইয়ের কোন প্রকার সম্পর্ক আছে বলে আপনি মনে করেন অথবা আপনি আপনার এলাকার পুকুর নিয়ে কিছু ভেবেছেন যা বলতে চান তা আমাদের জানালে ভালো লাগবে।

নিরুপমা অধিকারী

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোচ্ছে। নতুন কিছু বিষয় নয়। বেরিয়ে গেছে মূল বইয়ের পঞ্চম সংস্করণ। বিক্রির সংখ্যা একলক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। সংখ্যাটা এখানে বাণিজ্যিক দিক থেকে ততটা গুরুত্বের নয় যতটা বইটির জনপ্রিয়তা। বহু মানুষ বইটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। তাই ভূমিকাতে বিশেষ কিছু বলার নেই। প্রথম সংস্করণে বইটির পরিচয় পত্রে আমরা লিখেছিলাম ''আজ ভি খরে হ্যায় তালাব'- বইটি পুকুর সমন্ধে আমাদের নতুন করে ভাবানোর, পুকুরকে নতুন করে জানানোর ভূমিকা নিয়েছে। এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আশায় বাংলার যোগদান।' আজ আর আশা নয়, বইটি আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। যে আন্দোলন থেকে রচিত হবে ইতিহাস।

বিশেষ কারো উপকার করবো বলে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলাম, এমন নয়। উপকার করার মূল্য অনেক। দেবার সামর্থ নেই। যাই হোক সমাজে বাস করি কিছুটা সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, কিছুটা অন্তরের তাগিদ, কিছুটা ভয় মেশানো জলের নেশা মিলিয়ে এই আন্দোলনে যোগদান। ভয় মেশানো এই জন্যই - খরা নামে পরিচিত পুরুলিয়ার মেয়ে আমি। জীবন দিয়ে অনুভব করেছি জলসঙ্কট কি, জলসমস্যা কাকে বলে। আবার সেই সঙ্গে দেখেছি পুরুলিয়ার পুকুরের সংস্কৃতি।

বক্তব্য আমার কাছে পরিষ্কার। আপ্রাণ চেষ্টা করেছি পাঠক পাঠিকার কাছেও প্রাঞ্জল করে তুলতে। ত্রুটি বিচ্যুতি হয়তো অনেকই থেকে গেলো। ক্ষমা চাইছি না। সাধারণ মানুষের সহনশীলতা ও ভালবাসায় বিশ্বাস রাখি। ভয় থেকে গেলো তথাকথিত কিছু শিক্ষিত ব্যক্তিদের। তবে তারা সংশোধনে সাহায্য করলে ঋণী থাকবো।

কৃতজ্ঞতা আমার অনেকের কাছেই। কৃতজ্ঞতা সেই সমস্ত সমাজ রক্ষকদের কাছে যাঁরা শতাব্দীর পর শতাব্দী পুকুরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন; অনুপমজীর কাছেও, যিনি ভুলে যাওয়া এই ঐতিহ্যকে এত সুন্দর ও বিনম্র ভাবে তুলে ধরেছেন; শ্যামদার কাছেও, যিনি আমাকে এই আন্দোলনের পথ চিনিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা পরিবেশের কাছে, প্রকৃতির কাছে। আর দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাতে হয় বিনায়ক ভট্টাচার্যকে। সঞ্জয় অধিকারী ও পীযূষ কান্তি ভুঁই এই সংস্করণের প্রুফ দেখায় সহযোগিতা করেছে, ধন্যবাদ তাদেরও।

নিরুপমা অধিকারী

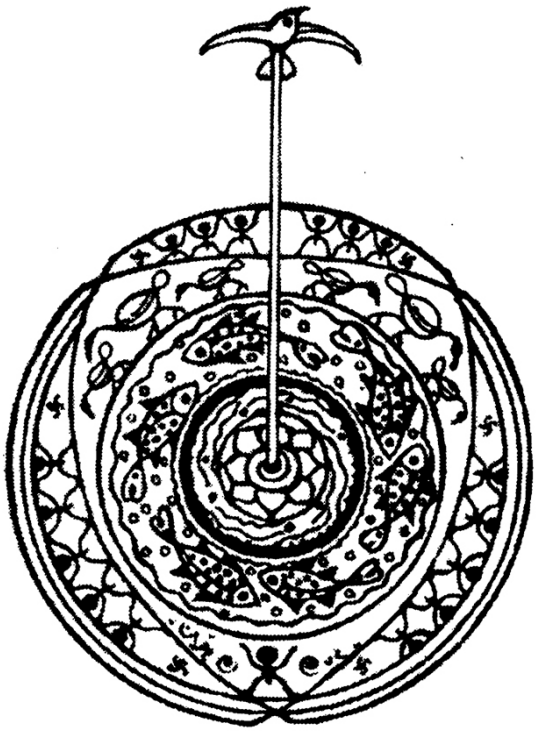

পাড়ের ধারে রাখা ইতিহাস	১১
ভিত থেকে শিখর পর্যন্ত	১৬
সংসার সাগরের নায়ক	২২
সাগরের আগর	৩৫
সাফ মাথার সমাজ	৪৭
সহস্রনাম	৫৫
মরীচিকাকে মিথ্যে করে পুকুর	৬৪
পুকুর বাঁধা ধর্ম স্বভাব	৭৮
আজও পুকুরগুলি খাঁটি	৮৬
তথ্যসূত্র	৯৩

পাড়ের ধারে রাখা ইতিহাস

"ভালো ভালো কাজ করে যেয়ো" - রাজা বলেছিলেন কুড়ন চাষীকে। কুড়ন, বুঢ়ান, সরমন ও কোঁরাই চার ভাই। চার ভাই-ই ভোরে উঠে নিজেদের ক্ষেতে কাজে চলে যেতেন। দুপুরবেলা কুড়নের মেয়ে খাবার নিয়ে যেতো পুঁটলি করে।

একদিন খাবার নিয়ে যাবার সময় মেয়েটা একটা দাঁতালো পাথরে হোঁচট খায়। হোঁচট খেয়ে পাখরটার ওপর তার খুব রাগ হলো তাই দা দিয়ে সে সটা উপড়ে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু একী! দা পাথর স্পর্শ করতেই লোহা থেকে বদলে গেলো সোনায়! এরপর খুব দ্রুত বদলে যায় এই কাহিনীর ঘটনা - মেয়েটা পাথর তুলে নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে এসে পৌঁছায় ক্ষেতে। এক নিঃশ্বাসে বাবা-কাকাদের বলে ফেলে পুরো ঘটনা। চার ভাই-এরও নিঃশ্বাস আটকে আসে। সকলে তাড়তাড়ি ঘরে ফেরে। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন তাঁদের হাতের পাথরটি সাধারণ পাথর নয়, পরশপাথর। পাথরটি যে জিনিস-ই ছোঁবে তাই সোনা হয়ে তাঁদের চোখ ঝলসিয়ে দেবে।

অবশ্য চোখের এই ঝলকানি বেশীক্ষন টেঁকে না। কুড়নের মনে হয় বেলা বাড়তেই খবরটা পৌঁছে যাবে রাজার কাছে এবং পাথরটি কেড়ে নেওয়া হবে। তার থেকে ভালো সে নিজেই গিয়ে রাজাকে সবকিছু বলে।

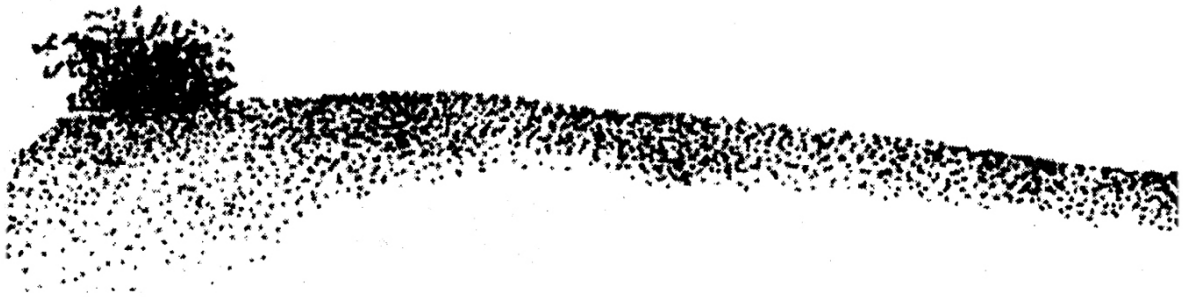

এই গল্প সত্য, ঐতিহাসিক-
জানি না।
কিন্তু কার্যত ইতিহাসকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে
এই গল্প, দেশের মধ্যভাগের এক বড় অংশে
মানুষের মন ভরিয়ে রেখেছে।

কাহিনী এগিয়ে চলে। এরপর যা কিছু ঘটে চলে তা লোহা নয়, তা হয়ে ওঠে সমাজকে পরশে ছোঁয়ানোর গল্প।

রাজা না পরশ নেন, না সোনা। সব কিছু কুড়নকে ফিরিয়ে দিয়ে বলেন, যাও এ-দিয়ে ভালো ভালো কাজ কোরো, পুকুর তৈরী করিয়ে যেয়ো।

এই গল্প সত্য, ঐতিহাসিক - জানি না। কিন্তু কার্যত ইতিহাসকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে এই গল্প দেশের মধ্যভাগের এক বড় অংশে মানুষের মন ভরিয়ে রেখেছে। এখানকার পাটন[১] নামক এলাকায় খুব বড় বড় চারটে পুকুর আজও দেখতে পাওয়া যায় এবং যারা গল্পটিকে ইতিহাসের কষ্টিপাথরে যাচাই করতে চায় তাদের লজ্জা দিয়ে থাকে। চারটি পকুর এই চার ভাইয়ের নামেই। বুঢ়াগরে রয়েছে বুঢ়া সাগর, মাঝগ্রামে সরমন সাগর, কুয়াঁ গ্রামে কোঁরাই সাগর ও কুণ্ডম গ্রামে কুণ্ডম সাগর। সময়টা ১৯০৭ সাল। কিছু ইংরাজ এই এলাকা পরিদর্শনে আসে। উদ্দেশ্য গেজেটিয়ারকে ভিত্তি করে ইতিহাস লিখন। তারা এলাকার অনেকের মুখেই এই কাহিনী শোনে এবং পুকুরগুলি ঘুরেও দেখে। তখন সরমন সাগর এত বড় যে তার ধারে তিনটে বড় বড় গ্রামের বসতি। তিনটি গ্রামই পুকুরটিকে নিজের নিজের নামে ভাগ করে নিত এবং এই বিশাল পুকুরটি তিনটি গ্রামকেই যুক্ত করতো ও সরমন

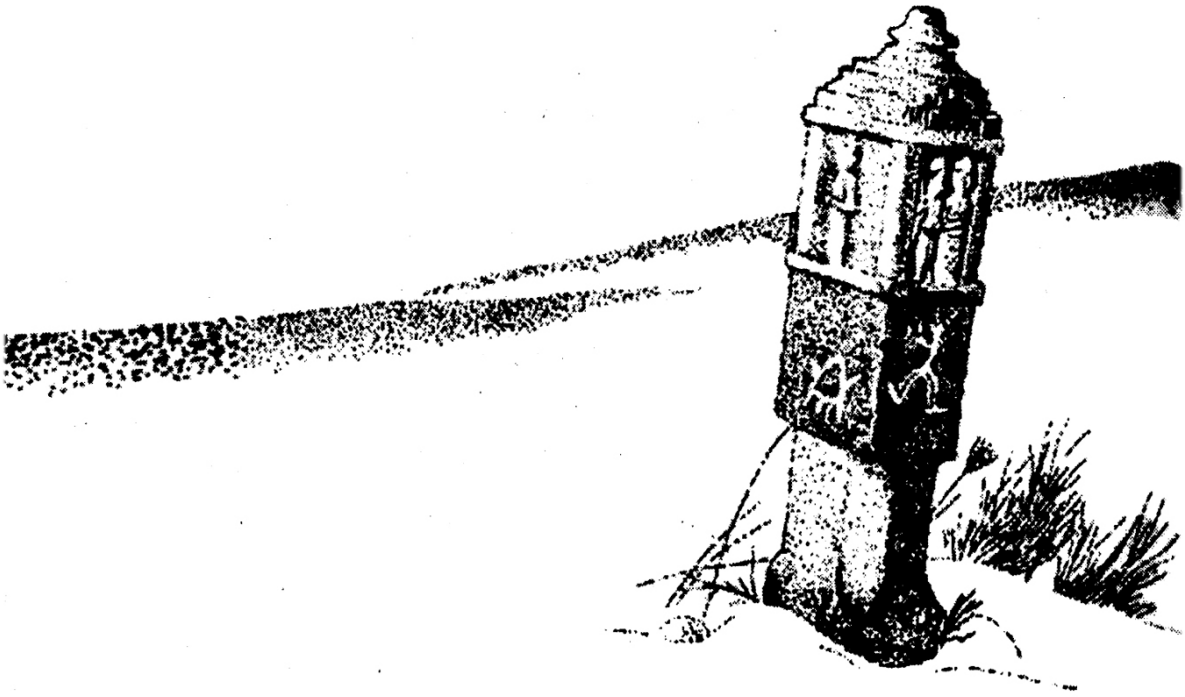

পুকুরের আগৌরে স্থাপিত স্তম্ভ

সাগরের মতোই স্মরণ করা হতো। সরমন, বুঢ়ান, কোঁরাই ও কুড়নকে - ইতিহাসকে মনে রাখতে হয়নি। পকুর তৈরী করে এঁরাই ইতিহাস প্রতিষ্ঠা করলেন।

দেশের মধ্যভাগে বা হৃদয়ে স্পন্দিত এই কাহিনীই পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ চতুর্দিকেই কোন না কোন ভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। আর তারই সঙ্গে পাওয়া যায় শত-শত, হাজার-হাজার পুকুর। এই পুকুরগুলির ঠিক হিসেব নেই আর হিসেব করার ঠিকমতো লোকও নেই। কিন্তু পুকুর তৈরী করার লোক বারে-বারে এসেছেন এবং পুকুর তৈরী করে গেছেন।

কোন পুকুর রাজা তৈরী করিয়েছেন তো কোনটা রানী, কোনটা সাধারণ গৃহস্থ, কোনটা বিধবা কোন রমনী আবার কোনটা হয়ত অসাধারণ কোন সাধু-সন্ত। তবে যিনিই পুকুর করিয়েছেন তাঁকে মহারাজা বা মহাত্মাই বলা হয়েছে। যাঁরা পুকুর তৈরী করেছেন তাদের অমরত্ব দিয়েছে কৃতজ্ঞ সমাজ আর পুকুর তৈরী করে মানুষও সমাজের প্রতি সমান কৃতজ্ঞ।

সমাজ ও তার সদস্যদের মধ্যে এই যুগলবন্দী পথচলা এক দীর্ঘ সময় চলেছিলো। রামায়ণ, মহাভারতের সময়কার পুকুরগুলির কথা যদি আমরা ছেড়েও দিই, তাহলেও বলা যায় পঞ্চম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত পুকুর তৈরী হয়ে চলেছিলো

দেশের এ প্রান্ত থেকে ঐ প্রান্ত পর্যন্ত। প্রায় এক হাজার বছর অবাধ গতিতে চলতে থাকা এই পরম্পরায় পঞ্চদশ শতাব্দীর পর কিছু বাধা আসতে শুরু করে। তবুও পুরোপুরি শুকিয়ে যায়নি, বন্ধ হয়ে যায়নি। এই কাজ সমাজ এত দীর্ঘসময় ধরে এবং এত ব্যবস্থাসম্মত ও নিয়মিতভাবে করেছিলো যে বিপর্যয়ের সেই সময়ও সে কাজ পুরোপুরি নষ্ট করতে পারেনি। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত নানাস্থানে পুকুর তৈরী হয়েছে।

এর পর পুকুর তৈরীর লোক ধীরে ধীরে কমে এলো। গোণার জন্য কিছুলোক অবশ্যই আসে তবে কাজের ব্যাপ্তির তুলনায় সে সংখ্যাটা ছিলো নেহাতই কম। এবং তাদের দক্ষতাও ছিলো তুলনামূলক ভাবে কম। তাই সঠিক গণনা কখনও হয়ে ও ঠেনি। আর একটু একটু করে আংশিকভাবে যেটুকু গোণা হয়েছিলো সেগুলি কখনো একত্র করা হয়নি। তবুও এই টুকরো টুকরো হিসেবগুলোই এত ঝলমলে যে এর থেকেই সামগ্রকি উজ্জ্বলতার ধারণা পাওয়া যায়।

জল টলটলে পুকুরগুলিকে শুকনো পরিসংখ্যানে গুটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা কোন দিক থেকে করা যায়? আবার ফেরা যাক দেশের মধ্যভাগেই। বর্তমান রিবা জেলায় জড়ৌরি নামক গ্রাম রয়েছে। জনসংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার কিন্তু গ্রামে পুকুর রয়েছে বারোটা। এরই কাছাকাছি তালমুকোদন। জনসংখ্যা প্রায় পনেরোশো, পুকুর দশটা। সব জিনিসকেই যারা গড়ের হিসেবে দেখতে চান তাদের জন্যও এই ছোট গ্রামগুলিতে প্রতি দেড়শো জনের জন্য একটি ভাল পুকুরের ব্যবস্থা রয়েছে।

জনসংখ্যার এই হিসেব তো এখনকার, যখন পুকুরগুলি তৈরী হয়েছিলো তখন জনসংখ্যা ছিলো আরও কম। অর্থাৎ তখন এই বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিলো যে নিজের এলাকার বর্ষণের প্রতিটি বিন্দু সংগ্রহ করে রেখে তা সঙ্কটের সময় যাতে আশপাশের লোকেদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যায়। বরুণ দেবতার প্রসাদ গ্রাম অঞ্জলি ভরে নিত।

আর যেখানে প্রসাদ কম পাওয়া যায়? সেখানে তো তার এক কণা, এক বিন্দুও কি কোন ভাবে নষ্ট হতে দেওয়া যেতো! দেশের সব থেকে কম বৃষ্টিপাতের এলাকা, যেমন রাজস্থান এবং তার মধ্যেও সব থেকে শুকনো বলে পরিচিত থর মরুভূমিতে অবস্থিত হাজার হাজার গ্রামের নাম পুকুরের নামেই পাওয়া যায়। গ্রামের নামের সঙ্গেই যুক্ত রয়েছে 'সর'। সর অর্থাৎ পুকুর। সর নেই তো গ্রাম কোথায়? ওখানে আপনি পকুরের বদলে গ্রামই গুণে যান এবং তারপর সেই সংখ্যাটাকে দুই বা তিন

দিয়ে গুণ করে দিন।

জনসংখ্যা যেখানে গুণিতকে বেড়েছে ও শহর গড়ে উঠেছে, সেখানেও জল ধার নেওয়া হয়নি কিংবা অন্য কোথা থেকে চুরি করে আনা হতো না। শহরগুলোও গ্রামগুলোর মতো নিজের ব্যবস্থা নিজেই করতো। অন্য শহরের কথা পরে, এক সময়ের দিল্লীতে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় সাড়ে তিনশো পুকুরের কথা শুনতে পাওয়া যায়।

গ্রাম থেকে শহরে, শহর থেকে রাজ্যে এলাম। আবার ফিরি রিবা গ্রামের কথায়। আজকের মানদণ্ডে একে পিছিয়ে পড়া এলাকা বলতে পারেন। কিন্তু জল ব্যবস্থার হিসেবে যদি দেখা যায় তো বিগত শতাব্দীতে এখানেই সব মিলিয়ে প্রায় পাঁচ হাজার পুকুর ছিলো।

দক্ষিণের রাজ্যগুলিকে দেখলে, দেখা যাবে স্বাধীনতা পাওয়ার প্রায় একশো বছর আগে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে তিপ্পান্ন হাজার পুকুর গোণা হয়েছিলো। ওখানে ১৮৮৫ সালে মাত্র চোদ্দটি জেলায় প্রায় তেতাল্লিশ হাজার পুকুরে কাজ চলছিলো। এইরকমই মহীশূর রাজ্যেও তীব্র উপেক্ষার সময়ও ১৮৮০ সাল পর্যন্ত উনচল্লিশ হাজার পুকুর কোন না কোন ভাবে কাজে আসছিলো।

এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে থাকা এই পরিসংখ্যান এক জায়গায় করে দেখলে বলা যেতে পারে যে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও আষাঢ়ের প্রথম দিন থেকে ভাদ্রের শেষ দিন পর্যন্ত প্রায় এগারো থেকে বারো লাখ পুকুর ভরে উঠতো এবং পরের জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত বরুণ দেবতার ঐ প্রসাদ সবাই মিলে কিছু না কিছু ব্যবহার করতো। কেননা মানুষ তখন ভালো ভালো কাজ করেই যেতো।

১। ঝাড়খণ্ড, বিহার, মানভূমে 'পাটন' শব্দটি একটি অতি পরিচিত শব্দ। যেকোন চাষীর মুখেই শোনা যায়- 'কিরে তোর জমিতে পাটন হলো? পাটন অর্থাৎ সেচ। শব্দটি দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীভুক্ত তামিল শব্দ।

ভিত থেকে শিখর পর্যন্ত

আজ উত্থান একাদশী। দেবতারা জেগেছেন। এখন ভাল কাজ করার জন্য শুভ মুহূর্ত বেছে নেওয়ার বা কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নেই। তবুও একে অন্যের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করছে, পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করছে, একটা নতুন পুকুর তৈরী হবে যে ...

পাঠকের মনে হতে পারে এখন তাঁরা পুকুর তৈরীর পাড় থেকে শুরু করে জল ভরে ওঠা পর্যন্ত সমস্ত বিবরণ পাবেন। আমরা নিজেরাও এরকম বিবরণ অনেক খুঁজেছি কিন্তু পাইনি। যেখানে বহুকাল ধরে পুকুর তৈরী হয়েছে এবং হাজার হাজার হয়েছে, সেখানে পুকুর তৈরীর পূর্ণ বিবরণ না থাকাটা আশ্চর্য লাগতে পারে। কিন্তু এই পরিস্থিতিটাই স্বাভাবিক পরিস্থিতি। কেননা, তখন চারদিকেই 'পুকুর কীভাবে করতে হয়'- এর বদলে 'পুকুর এইভাবে করতে হয়'- এর প্রচলন ছিলো। তবুও বিবরণের ছোট ছোট অংশগুলোকে জোড়া দিলে খুব সুন্দর না হোক কাজ চালানোর মতো একটা ছবি সামনে ফুটে উঠতে পারে।

আজ উত্থান একাদশী। জিজ্ঞাসা করার আর কী-ই বা আছে। সমস্ত কথাবার্তা তো আগেই সারা। পুকুরের জায়গাও ঠিক হয়ে গেছে। যাঁরা এসব ঠিক-ঠাক করেছেন তাঁদের চোখের সামনে কত বর্ষাই না বর্ষিত হয়েছে। তাই সেখানে এ প্রশ্ন ওঠে না যে জল কোথা থেকে আসবে, কত জল আসবে, তার কত ভাগ কোথায় আটকাতে হবে? এগুলো কোন সমস্যাই নয়। খুব সাধারণ কথা। হাতের তালুর মতো পরিচিত। এঁদের মধ্যে অনেক চোখই এর আগেও অনেক পুকুর খুঁড়েছেন এবং এমন কিছু চোখ রয়েছে যাঁরা বংশানুক্রমিক ভাবে এই কাজ করে চলেছেন।

সাধরণভাবে দশদিকই খোলা রয়েছে পুকুর করার জন্য। তবুও জায়গা নির্বাচনের সময় কয়েকটা কথা খেয়াল রাখতে হবে। গোচারণভূমির দিকে হবে এই জায়গা, ঢালু ও নীচু জমি, যেখান থেকে জল গড়িয়ে আসবে সেখানের মাটি হবে কাঁকুরে, সেদিকে সৌচকার্য প্রভৃতির কাজে মানুষ যায় না, মরা জন্তু জানোয়ার ফেলার জায়গা অর্থাৎ

ভাগাড়ও সেদিকে নেই।

অভ্যাস থেকে অভ্যাস বাড়ে। অভ্যস্ত চোখ কথাবার্তায় শোনা, নির্বাচিত জায়গা একবার দেখেও নেয়। সেখানে পৌঁছে 'আগৌর'[১] (যেখান থেকে জল আসবে) পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয় ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করে নেওয়া হয়। 'আগর' (যেখানে জল আসবে) তার স্বভাব পরখ করে দেখা হয়। পাড় কতটা উঁচু হবে কতটা চওড়া, কোনখান থেকে কতটা বাঁধা হবে, পুকুরে জল ভরে যাওয়ার পর তাকে রক্ষা করার জন্য কোথায় 'অপরা' তৈরী হবে তাও আন্দাজ করে নেওয়া হয়।

সকলেই এসে পৌঁচেছে। আর দেরী নয়। ঝকঝকে থালা সেজে উঠেছে। সূর্যের কিরণে তা আরও ঝলমল করছে। জলপূর্ণ ঘটি রয়েছে। রোলী, মোলী, হলুদ, আতপ চালের সঙ্গে রাখা হয়েছে লাল মাটির একটি ঢেলা। এ হলো পবিত্র ঢেলা। ভূমি ও জলের স্তুতিমন্ত্র ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছে তরঙ্গে।

যেখানে বহুকাল ধরে পুকুর তৈরী হয়েছে
হাজার হাজার হয়েছে, সেখানে পুকুর তৈরীর
পূর্ণ বিবরণ না থাকাটা আশ্চর্য লাগতে পারে
কিন্তু এই পরিস্থিতিটাই স্বাভাবিক পরিস্থিতি। কেননা, 'পুকুর
কীভাবে করতে হয়,'-এর বদলে তখন চারিদিকে
'পুকুর এইভাবে করতে হয়,'-এর প্রচলন ছিলো।

বরুণ দেবতাকে স্মরণ করা চলছে। দেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পুকুর যেখানেই খোঁড়া হোক, সমস্ত নদীকেই ডাকা হয়। মাটিতে টামনা মারার শব্দে মন্ত্রের তরঙ্গ থামে। পাঁচ জন পাঁচ পরাত মাটি কাটে। দশ হাত পরাত তুলে পাড়ে ঢালে। এখানেই পাড় বাঁধা হবে। গুড় বিলি করা হয়। শুভ মুহূর্তের অর্চনা শেষ। পুকুরের যে ছবি মনে রয়েছে, টামনা দিয়ে তার পুরো চিত্র মাটিতে এঁকে নেওয়া হয়েছে। কোনখান থেকে মাটি তোলা হবে। কোথায় কোথায় ফেলা হবে। পাড় থেকে কত দূরে খোঁড়া হবে, যাতে পাড়ের ঠিক নীচেই বেশী গভীর না হয়ে যায়। পাড়ের নীচে বেশি গভীর হলে জলের চাপে পাড় দুর্বল হতে থাকবে ...।

এই একাদশীতে এতটা হয়েই যায়। কিন্তু কোন কারণে যদি এদিন কাজ শুরু করা না যায় তাহলে আবার শুভ মুহূর্ত বার করতে হবে বা কাউকে দিয়ে বার করাতে হবে। শহরে বা গ্রামে ঘরে ঘরে যে পাঁজি পাওয়া যায় তাতে অনেক কিছুর তিথি বা শুভ মুহূর্তে সঙ্গে কুয়ো, বাউড়ি ও পুকুর তৈরীরও শুভ মুহূর্ত দেওয়া থাকে - উত্তরা, শতভিষা, মঘা, রোহিণী, মৃগশিরা, পূষ্যা ও মূলা নক্ষত্রতে সোমবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারে কাজ আরম্ভ করা যায়। কিন্তু চতুর্থী, নবমী ও চতুদর্শী তিথিগুলি ত্যাগ করতে হবে। আমাদের মধ্যে বেশীরভাগ মানুষই এই বিবরণের শুধুমাত্র কয়েকটা দিনের নামই বুঝতে পারবেন কিন্তু এখনও সমাজের একটা বড় অংশের মনের ঘড়ি এই ঘড়ির সঙ্গেই মেলে। কিছুদিন আগেতো গোটা সমাজটাই এই ঘড়িতে চলতো।

পুকুরের ডাট

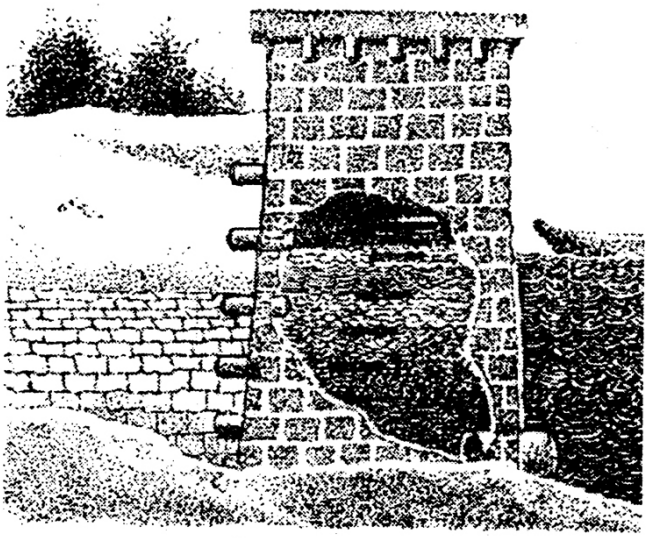

... শুভ মুহূর্তের অর্চনা শেষ। সকলে ঘরে ফিরছে। এবার কিছুদিন পর যেদিন সকলের সুবিধে সেদিন কাজ শুরু হবে। অভ্যস্ত দৃষ্টি এর মাঝে পলক ফেলে না। কত বড় পুকুর, কত সরঞ্জাম, কত মাটি খোঁড়া হবে, পাড়ে কত মাটি দেওয়া হবে, ঝড়া, বাঁক, হাতঝড়াতেই মাটি বয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে, না কিগাধাও লাগবে? ঢেউয়ের মতো প্রশ্ন ওঠে। কত কাজ কাঁচা হবে- মাটির, কত পাকা- চুনের। মাটির কাঁচা কাজ পাকাপাকি ভাবে করতে হবে, আবার পাথর ও চুনের পাকা কাজ যেন কাঁচা না থেকে যায়। প্রশ্নের ঢেউ যেমন ওঠে অভ্যস্থ মনের গভীরতায় তা শান্তও হয়ে যায়। সহস্র মণ মাটির ওজনদার কাজ। বয়ে যাওয়া জলকে দাঁড়ানোর জন্য রাজি করাতে হবে। জলের সঙ্গে খেলা, হ্যাঁ আগুনের সঙ্গে খেলা।

ডুগডুগি বাজে। গোটা গ্রামই পুকুরের জায়গায় জড়ো হয়। পুকুরের কাজ 'আমানি'তে চলবে। আমানি অর্থাৎ সকলে একই সঙ্গে কাজে আসবে ও একই সঙ্গে কাজ থেকে ফিরবে।

শত শত হাত মাটি কাটে, শত শত হাত পাড়ে মাটি ঢালে। আস্তে আস্তে প্রথম ধাপ সম্পূর্ণ হয়। একটা ধাপ ভরে উঠেছে দেখা যায়। এবার এই আলগা মাটি চেপে বসিয়ে দেবার পালা। এই কাজ করে 'নন্দী'। চার ধারালো খুরে ষাঁড়ের পুরো ওজন

পড়ে। প্রথম ধাপের কাজ শেষ হলে দ্বিতীয় দফার মাটি ঢালা শুরু হয়। প্রত্যেক ধাপেই জল ছড়ানো হয় ষাঁড় চালানো হয়। শত শত হাত তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে। প্রতিটি ধাপ খুবই ধৈর্যের সঙ্গে আস্তে আস্তে গড়ে উঠতে থাকে।

এতক্ষণ পর্যন্ত যা কোদালের অস্পষ্ট রেখা ছিলো, এখন সেখানে মাটি খোঁড়ার চিহ্ন স্পষ্ট। কোথাও তা সোজা তো কোথাও এঁকেবেঁকে চলা নদীর মতো। আগৌর থেকে আসা জল পাড়ের যেখানে নিজের শক্তি পরীক্ষা করতে পারে সেখানে পাড়ও সেইমতো মজবুত করা হয়। এই অংশটিকে 'কোহনি' বলে। পাড় এখানে ঠিক আমাদের কনুই-এর মত মুড়ে যায়।

সিমট-সিমট
জল ভঁরহি
তলাওয়া

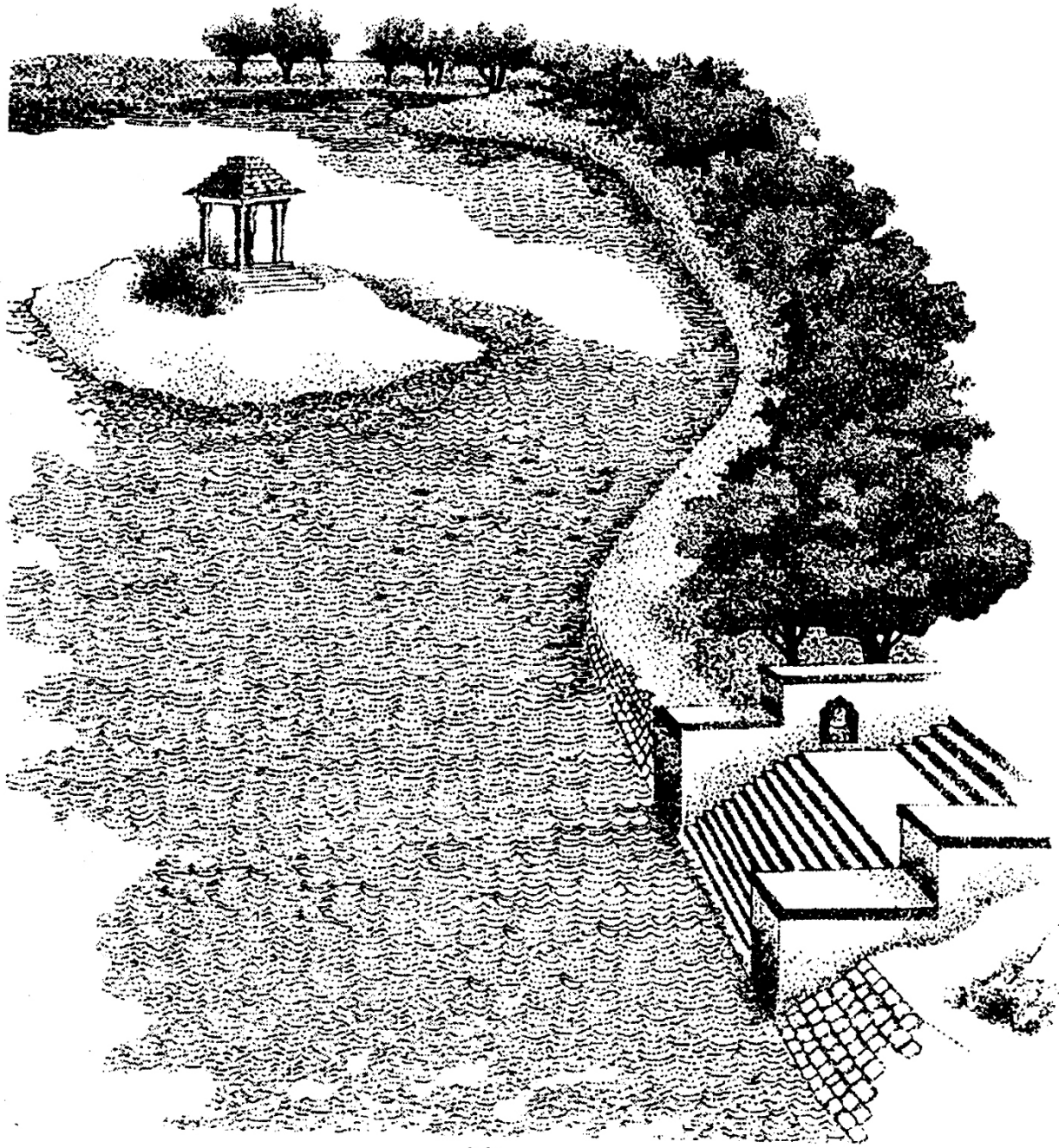

পুকুরের যায়গা ঘরের কাছে হলে, খাবার জন্য সকলে ঘরে যায়। আর দূরে হলে খাবার আসে। ওখানে অবশ্য সারা দিনই সকলকে গুড় দেওয়া মিষ্টি জল খাওয়ানো হয়। জলের কাজ ভালবাসার কাজ, পূণ্যের কাজ, তাই অমৃতের মতো মিষ্টি জল খাওয়াতে হয়। তবেনা অমৃতের মতো মিষ্টি সরোবর হবে।

এই অমৃত 'সর'-কে রক্ষা করবে পাড়। সে পুকুরের পালক। তবে পাড় নীচে কতটা চওড়া হবে, ওপরে কতটা, কতটা উঁচু হবে—এ ধরনের প্রশ্ন গণিত বা বিজ্ঞানের বোঝা বাড়ায় না। তবে অভ্যস্ত চোখের সহজ গণিতকে যদি কেউ মাপতেই চায় তো ভিতের চওড়ার অর্ধেক হবে উঁচু, আর পুরো উচ্চতার অর্ধেক হবে ওপরের চওড়া।

মাটির কাঁচা কাজ হয়ে এসেছে। এবার পাকা কাজের পালা। চুনকরদের চুন ভড়কানো শেষ। গরট প্রস্তুত। এবার গারা তৈরী হচ্ছে। পাথর কাটার দল পাথর কাটায় ব্যস্ত। রক্ষক পাড়কে ভাঙ্গন থেকে বাঁচাতে নেষ্টা তৈরী করতে হবে। নেষ্টা হলো পুকুরের সেই অঙ্গ যেখান থেকে অতিরিক্ত জল পাড়ের ক্ষতি না করে বয়ে যাবে। কখনও হয়তো এই শব্দটা 'নিসৃষ্ট', 'নিস্তরণ' অথবা 'নিস্তার' ছিলো। পুকুর প্রস্তুতকারকদের মুখে মুখে ব্যবহার হতে হতে কেটে ছেঁটে 'নেষ্টা' রূপে এমন মজবুত হয়ে গেছে যে কয়েকশো বছরে এর একটা মাত্রাও আর খুলে পড়েনি।

নেষ্টা পাড়ের উচ্চতার কিছুটা নীচে হবে, তবেই না পাড় ভেঙ্গে ফেলার আগেই জল বয়ে যাবে। মাটি থেকে এর উচ্চতা পাড়ের উচ্চতার অনুপাতে হয়। যেমন দশ হাত ও সাত হাতের।

পাড় ও নেষ্টার কাজ শেষ। আর সেই সঙ্গেই শেষ হয় আগরের কাজও। আগৌরের সব জল গড়িয়ে এসে আগরে পড়বে। অভ্যস্থ চোখ আরও একবার আগৌর ও আগর পরীক্ষা করে নেয়। আগরের ক্ষমতা আগৌর থেকে আসা জলের ক্ষমতার থেকে বেশী অথবা কম নয়তো? উত্তর অবশ্য কখনই হ্যাঁ হয় না।

শেষবারের মতো ডুগডুগি বাজানো হচ্ছে। কাজ শেষ হয়ে গেছে, তবুও আজ সকলে পুকুর পাড়ে জড়ো হবে। একাদশীর দিন যে সঙ্কল্প নেওয়া হয়েছিলো আজ তা পূর্ণ। শুধু আগৌরে স্তম্ভ ও ঘাটে ঘাটেয়াবাবার প্রাণ প্রতিষ্ঠা বাকি। আগৌরের স্তম্ভের ওপরে গনেশজী বিরাজ করেন ও নীচে সর্পরাজ। ঘাটেয়াবাবা ঘাটে বসে পুরো পুকুর রক্ষা করবেন।

আজ সকলের এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুন্দর মজবুত পাড় ঘেরা পুকুর। দূর থেকে দেখতে লাগছে যেন বড় একাটা থালা। যে পরিচয়হীন লোকেরা এটি তৈরী করেছেন, প্রসাদ বিতরণ করে তাঁরা এর একটি সুন্দর নামও দেবেন। আর সেই নাম কোন কাগজে নয়, লেখা হয়ে থাকবে মানুষের হৃদয়ে। তবে

নামের সঙ্গেই কাজ শেষ নয়, এরপর যখনই হস্তা নক্ষত্র উঠবে, জলের প্রথম ধারা পড়বে, সকলে মিলে আবার পুকুরে জড়ো হবে। অভ্যস্ত চোখ তো আজই কষ্টিপাথরে যাচাই হবে।

গরট

সকলে কোদাল, টামনা, বাঁশ, লাঠি নিয়ে পাড়ে ঘুরছে। এত যত্নের সঙ্গে এক-এক ধাপে গড়ে ওঠা পাড়ও বর্ষার প্রথম জল না খেলে মজবুত হয় না। যেকোন জায়গাই ধ্বসে পড়তে পারে। ফাটল দেখা দিতে পারে। আর ইঁদুরের গর্ত করতেই বা কতক্ষন লাগে। পুকুরে যাঁরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন বাঁশ দিয়ে, লাঠি দিয়ে, তাঁরা এই গর্তগুলোই বন্ধ করছেন।

গত দিনগুলিতে যেমন ধীরে ধীরে পাড় উঠেছিলো, আজ তেমন আগরে জল উঠছে। জল আজ পুরো আগৌর থেকে একটু একটু করে গড়িয়ে নেমে আসছে।

সিমট-সিমট জল ভঁরহি তলাওয়া
জিমী সদগুণ সজ্জন পহিঁ আওয়া।।

খ্যাতিহীন পরিচয়হীন হাতের ভালবাসা জল স্বীকার করে নেয়।

১। পশ্চিমবঙ্গে পুকুরের জায়গা নির্বাচন ও আগৌরের যথেষ্ট গুরুত্ব রযেছে। এখানে পকুরের জায়গা নির্বাচন হয় আগৌর, আগাড় বা গড়ানে বয়ে আসা জল জমা হতে পারে এমন জায়গায়। কখনও কখনও যার একদিক বা দুইদিক বেঁধেই হয়ে ওঠে বড়সড় বাঁধ (এই অঞ্চলে পুকুরের তুলনায় বাঁধেরই প্রচলন বেশী) অবশ্য বর্তমানে বড় বড় ভালো বাঁধগুলিরও আর আগৌর অবশিষ্ট নেই। ফলে বাঁধগুলি ধীরে ধীরে গুটিয়ে ছোট হয়ে আসছে।

সংসার সাগরের নায়ক

কারা ছিলেন এই খ্যাতিহীন লোকেরা?

শত শত হাজার হাজার পুকুর তো হঠাৎ শূন্য থেকে প্রকট হয়নি। এ ক্ষেত্রে পুকুর যাঁরা তৈরী করাতেন তাঁরা যদি 'এক' হন তো যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়ে পুকুর তৈরী করতেন তাঁরা হলেন 'দশ'। আর এই একক, দশক মিলেই তো হয় শতক, হাজার। কিন্তু গত দুশো বছবের নতুন শিক্ষা কাঠামোয় তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ এই একক, দশক, শতক, হাজারকে শূন্যেই পরিণত করে ফেলেছে। এই নতুন সমাজের মনে এতটুকু কৌতুহল পর্যন্ত নেই যে তাদের আগে এত পুকুর কারা তৈরী করতেন ! নতুন শিক্ষা কাঠামো আই আই টি তে, সিভিল ইঞ্জিয়ারিং প্রভৃতি যে সমস্ত কোর্স চালু হয়েছে, সেই সমস্ত কোর্সের পরিচালকরা বা শিক্ষার্থীরাও কোনদিন তাদের নিজেদের মাপকাঠি দিয়ে, মগজ দিয়ে তাদের আগের এই কাজগুলিকে মেপে দেখার কোন চেষ্টাই করেনি।

তারা নিজেদের গজ দিয়েও যদি মাপতো তাহলেও তাদের মনে এই প্রশ্নটা তো অন্তত আসতো যে কোথায় ছিলো সেই সময়ের আই আই টি, সেগুলির শিক্ষকই বা কারা ছিলেন, কত ছিলো সেগুলোর বাজেট, কতজন ইঞ্জিনিয়ার বেরতো? কিন্তু তাদের কাছে পুরোনো দিনের এই কাজগুলিও পুরনো হয়ে যায় এবং তারা জলের প্রশ্নের মীমাংসা আধুনিক পদ্ধতিতে করার প্রতিশ্রুতি দেয়। শুধু প্রতিশ্রুতিই নয় এই মীমাংসা যে তারা করতে পারবে এমন দাবীও জানায়। গ্রাম বা ছোট শহরের কথা-আর কে-ই বা বলে। এই দাবী ও প্রতিশ্রুতির পরিহাসময় উদাহরণ হলো বড় শহরগুলির পাইপে সবসময়ের বয়ে আসা নৈঃশব্দ। বর্তমান সময়ের দাবিগুলিকে যদি বর্তমান সময়েরও গজ দিয়ে মাপা হয় তাহলে দেখা যাবে কখনও দাবি ছোট লাগছে তো কখনও গজই ছোট পড়ছে।

এই গজকে এখন এখানে রেখে খানিকটা পিছনে ফেরা যাক। আজ যাঁরা পরিচয়হীন

হয়ে গেছেন একদিন তাঁদের খুবই নাম ডাক ছিলো। সারা দেশ জুড়ে পুকুর তৈরী হতো, আর যাঁরা তৈরী করতেন তাঁরাও ছড়িয়ে ছিলেন সারা দেশ জুড়ে। কোথাও কোথাও এই শিক্ষা ছিলো জাতিগত আর কোথাও তা জাত থেকে কিছুটা সরে গিয়ে বিশেষ এক শ্রেণী (পাঁত) তৈরী করতো। পুকুর যাঁরা তৈরী করতেন তাঁরা স্থায়ীভাবেও বসবাস করতেন আবার কোথাও কোথাও কাজ করতেন ঘুরে ঘুরে।

যাঁরা পুকুর তৈরী করতেন তাঁদের সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করার জন্য একটি সুন্দর শব্দ হলো 'গজধর'। রাজস্থানের কিছু জায়গায় এই শব্দটি আজও বেঁচে রয়েছে। গজধর অর্থাৎ যিনি গজ ধারণ করেছেন। আর গজ তো সেটাই যা মাপার কাজে ব্যবহার হয়। তবে সমাজ এঁদের তিনফুট লোহার রড নিয়ে ঘুরে বেড়ানো মিস্ত্রী মনে করতো না। গজধর তো প্রকৃতপক্ষে সমাজের গভীরতা মেপে ফেলেন, তাই সম্মানের সেই স্থানই তাঁকে দেওয়া হয়েছে।

গজধর ছিলেন বাস্তুকার। গ্রাম-সমাজ হোক বা নগর-সমাজ, তা নব নির্মানের দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করতেন গজধর। নগর নিয়োজন থেকে শুরু করে ছোট ছোট নির্মানের কাজও গজধরের কাঁধে ন্যস্ত ছিলো। তিনি পরিকল্পনা তৈরী করতেন, বাজেট নির্ধারণ করতেন, কাজের প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তুসামগ্রী জোগাড় করতেন কিন্তু এ-সমস্ত কিছুর পরিবর্তে যজমানের কাছে

গজধর

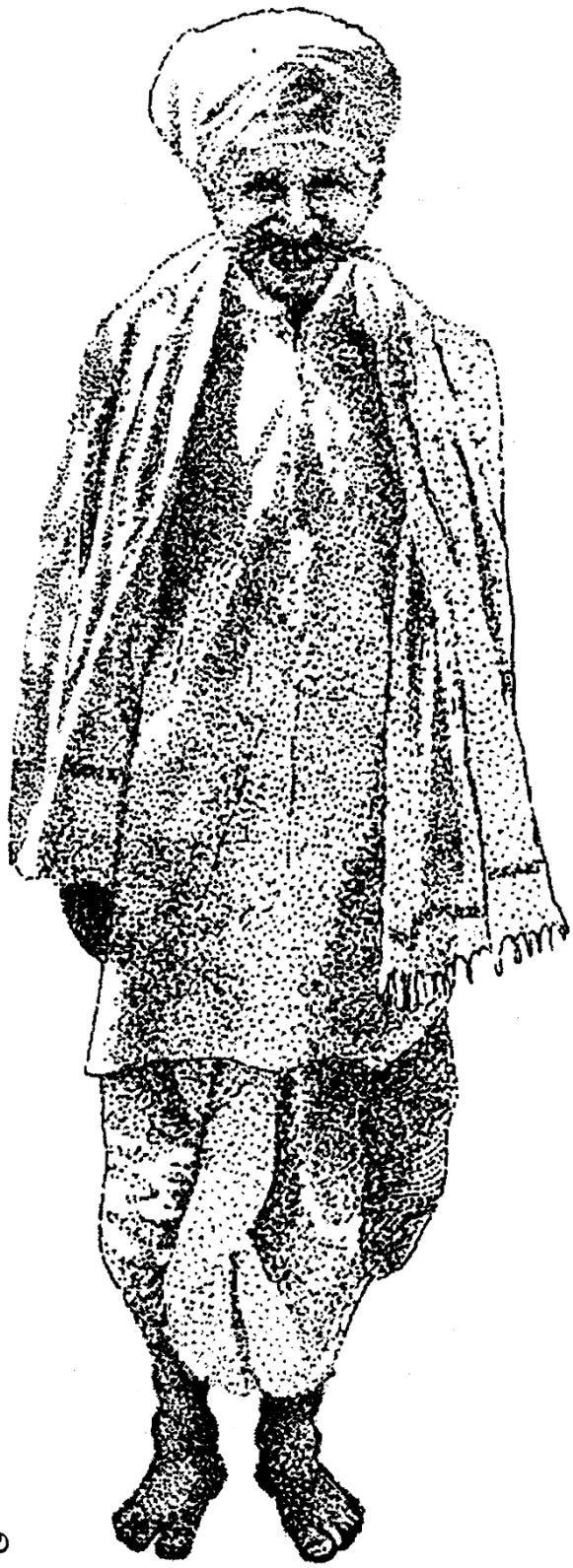

এমন কিছু তিনি চেয়ে বসতেন না, যা সে দিতে পারবে না। মানুষজনও ছিলো সেরকম, তাঁদের দ্বারা যা কিছু সম্ভব হতো তা গজধরকে উপহার দিতে তাঁদের এতটুকুও কুণ্ঠা ছিলো না।

কাজ শেষ হলে পারিশ্রমিক ছাড়াও গজধর পেতেন সম্মান। শিরস্ত্রাণ উপহার দেওয়ার রীতি বর্তমানে সম্ভবত শুধুমাত্র শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যেই রয়ে গেছে। কিন্তু কিছুদিন আগে পর্যন্তও রাজস্থানে গৃহস্থদের তরফ থেকে গজধরকে খুব সম্মানের সঙ্গে শিরস্ত্রাণ উপহার দেওয়া হতো। তার নামে জায়গা লিখে দেওয়ার রেওয়াজ ছিলো। গজধরের সঙ্গে কাজ করতেন যে সমস্ত লোক, পাগড়ি পরার পর গজধর তাঁদের মধ্যে কিছু লোকের নাম ঘোষণা করতেন। তঁদেরও পারিশ্রমিক ছাড়াও কিছু না কিছু উপহার দেওয়া হতো। কৃতজ্ঞতার এই ভাব সব থেকে বেশি দেখতে পাওয়া যেত পুকুর তৈরীর পর যে ভোজ হতো তাতে।

গজধর হিন্দু ছিলেন, পরবর্তীকালে মুসলমানও। 'সিলাওট' বা 'সিলাওটা' নামে এক জাতি স্থাপত্য শিল্পে খুব নিপণ ছিলেন। সিলাওটা শব্দ শিলা অর্থাৎ পাথর থেকে এসেছে। সিলাওটারাও গজধরদের মতো দুই ধর্মেরই হতেন। এঁদের নিজেদের পাড়া ছিলো। এখনও রাজস্থানের পুরোনো শহরে সিলাওটা পাড়া পাওয়া যায়। সিন্ধুপ্রদেশ, করাচীতেও সিলাওটাদের জনবহুল পাড়া রয়েছে। সিলাওটা ও গজধর একই কাজ করতেন দুই নামে। কোথাও কোথাও আবার মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে । জয়সলমের ও সিন্ধে সিলাওটাদের নায়ককেই গজধর বলা হতো। করাচীতেও এঁদের যথেষ্ট সম্মান ছিলো। দেশভাগের পর পাকিস্তান মন্ত্রীমণ্ডলেও এক সিলাওটা - 'হাকিম মহম্মদ' গজধরের নিযুক্তি হয়েছিলো।

এঁদেরই একটা শাখা ছিলো তামোর বংশের বংশধর। সমাজ নির্মাণের উচ্চ পদে এঁরা বার বার অধিষ্ঠিত হয়েছেন। অনঙ্গপাল তওঁরকে কোন এক সময় দিল্লীতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার সম্মান প্রদান করা হয়েছিলো।

অভ্যস্ত চোখের সুন্দর উদাহরণ হলেন গজধর। গুরু-শিষ্য পরম্পরা অনুসারে কাজ শেখানো হতো। পুরনো হাত নতুন হাতকে এমনই শিক্ষা দিতেন, এমন ভাবে তুলে ধরতেন যে কিছু দিনের মধ্যেই নতুন হাত 'জোড়িয়া' হয়ে যেতেন। জোড়িয়া অর্থাৎ গজধরের বিশ্বস্ত সাথী। একজন গজধরের সঙ্গে কয়েকজন জোড়িয়া থাকতেন। কিছু ভালো জোড়িয়া সঙ্গে পেলে গজধর ক্রমে এত দক্ষ হয়ে উঠতেন যে তারপর তাঁর নামই শুধু গজধর থেকে যেতো, গজ আর তাঁর লাগতো না। ভালো গজধরের পরিভাষাই ছিলো তিনি হাতিয়ারে হাত লাগাবেন না। শুধু জায়গা দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন কোথায় কী করতে হবে। তিনি এক জায়গায় বসে থাকতেন এবং তাঁর মৌখিক

নির্দেশেই কাজ চলতো।

হাতিয়ার বা সরঞ্জাম ব্যবহার করতে করতে দক্ষ হয়ে ওঠা, এমনই দক্ষ যে হাতিয়ারের আর প্রয়োজনই থাকে না — এটা এক কথা আর স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতা, এটা অন্য কথা। এরকম দক্ষতা যাঁরা অর্জন করেন তাদের বলা হতো 'শিরভাব'। শিরভাব কোন হাতিয়ার ছাড়াই জলের ঠিক জায়গা বলে দিতেন। বলা হয় তাঁর ভাব আসতো, অর্থাৎ তিনি বুঝতে পারতেন। শিরভাব কোন বিশেষ জাতির হতেন না। কেউ কেউ এই সিদ্ধি অর্জন করতেন। 'জলসুঁঘা' অর্থৎ ভূ-জল সুঁঘে (ঘ্রাণ নিয়ে) যাঁরা বলে দিতে পারতেন। এঁরাও ছিলেন শিরভাবের মতোই, তবে এঁরা আম বা জাম কাঠের সাহায্যে ভূ-জলের তরঙ্গ সঙ্কেত বুঝে নিয়ে জলের ঠিকানা বলে দিতেন। এই প্রক্রিয়াটির দেখা এখনও পাওয়া যায়। টিউবওয়েল খোঁড়ে যে কোম্পানিগুলো তারা প্রথমে যন্ত্র দিয়ে জায়গা বেছে নেয়, তারপর এঁদের ডেকে এনে নিশ্চিতভাবে জেনে নেয় জল পাওয়া যাবে কি না! সরকারী ক্ষেত্রেও কাগজে কলমে না দেখিয়ে এঁদের পরিষেবা নেওয়া হয়।

সব ব্যবস্থায় সম্পন্ন সমাজ

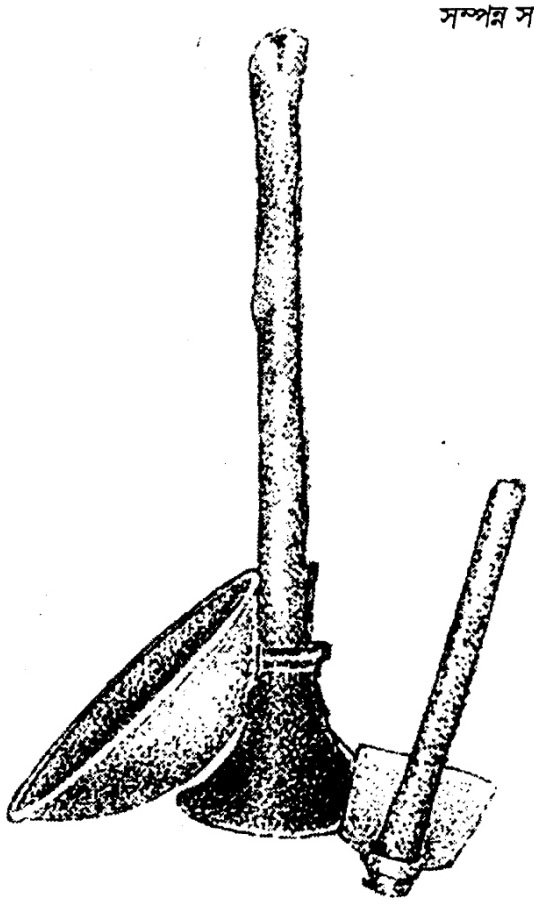

সিলাওটা শব্দ মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত পৌঁছাতে পৌঁছাতে একমাত্রা হরিয়ে সিলাওট হয়ে যায়। অবশ্য গুণ সেই একই। দেশের মধ্যভাগে সিলকরও ছিলো কোথাও কোথাও। গুজরাতে এই সিলকররা প্রচুর সংখ্যায় রয়েছেন। সেখানে এঁদের সলাট বলা হয়। এঁদের মধ্যে 'হীরা-সলাট' পাথরের কাজেও যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

কচ্ছতে গজধর হয়ে গেছেন গইধর। তাঁদের বংশের ধারা শুরু হয় ইন্দ্র-পুত্র জয়ন্ত থেকে। গজধরদের আরও এক নাম সূত্রধার, এই সূত্রধারই পরে গুজরাতে ধার এবং দেশের আরও কিছু জায়গায় সুথার হয়ে যান।

গজধরের আরও এক শাস্ত্রীয় নাম 'স্থপতি'। যা থবিত রূপে আজও প্রচলিত রয়েছে।

পথরোট ও কৌরি জাতি পাথরের সমস্ত ধরণের কাজ খুব ভালো মতো জানতেন। এঁরা পুকুর তৈরীর কাজও করতেন। মধ্যপ্রদেশের 'পথরোটা' নামে গ্রাম ও পাড়া আজও এঁদের স্মরণ করায়। কৌরিরা ছড়িয়েছিলেন দূর দক্ষিণ পর্যন্ত। এঁদের পাড়াকে বলা হতো টকের বাড়ি।

'এই জগৎ মাটির তৈরী', আর এই মাটির জগৎকে চিনতেন জানতেন এমন লোকেরও অভাব ছিলো না। এঁদের বলা হোত মটকুট। আবার কোথাও বা মটকুড়া। যে গ্রামে তাঁরা বসবাস করতেন সেই গ্রামকে বলা হতো মটকুলি। সোনকর ও সুনকর শব্দ ছিলো তাদের জন্য যাঁরা সোনার কাজ করতেন। তবে এই সোনা, সোনা নয়, মাটিই। সোনকর বা সুনকরদের রাজলহরিয়াও বলা হয়েছে। তাঁরা রঘুবংশের সম্রাট সগরের বংশধর বলে নিজেদের পরিচয় দিতেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া চুরি হয়ে গেলে সগর পুত্ররা তা খুঁজতে গিয়ে সারা পৃথিবী খুঁড়ে ফেলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা কপিল মুনির ক্রোধের পাত্র হয়ে পড়েন। সেই অভিশাপের কারণে সোনকর মাটি কাটার কাজ করতেন। কাজ করে অবশ্য অভিশাপ নয় পূণ্যই অর্জন করেছেন। এই সোনকররা ইঁট তৈরীর কাজেও যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। খঁতিদেরও পুকুরের মাটি কাটার কাজে ডাকা হতো। যেখানে এঁরা থাকতেন না সেখানে পুকুরের মাটি বিষয়ে পরামর্শ করা হতো কুমহারদের সঙ্গে।

পুকুরের জায়গা নির্বাচনের সময় 'বুলাই' না ডাকলেও আসতেন। বুলাই অর্থাৎ যাঁর কাছে গ্রামের সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া যেতো। কোন জায়গার মাটি কেমন, জায়গা কার, কোন জায়গায় পুকুর বাউড়ি আগেই হয়ে গেছে, কোথায় কোথায় হতে পারে -- এই রকম সমস্ত তথ্য বুলাইয়ের কণ্ঠস্থ থাকতো। এছাড়াও তাঁর কাছে এ সবের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লিখিত হিসেবও পাওয়া যেতো।

মালওয়া এলাকার দলিলে এই সমস্ত তথ্য বুলাই-এর সাহায্যেই নথিভুক্ত করা হতো। এই দলিল প্রতিটি জমিদারীতে নথিভুক্ত থাকতো।

বুলাইকে কোথাও কোথাও 'ঢের'-ও বলা হয়েছে। মির্ধারাও এই ধরনেরই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এঁরা জমির মাপ-জোক, হিসেবপত্র এমন কি জমি সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি পর্যন্ত করতেন।

চুনকর করতেন ইঁট ও চুনের গারার কাজ। অবসর সময় এঁরা নুনের ব্যবসাও করতেন। বর্তমান মধ্যপ্রদেশে ১৯১১ সালে চুনকরদের সংখ্যা ছিলো পঁচিশ হাজারেরও বেশী। ওদিকে উড়িষ্যায় ছিলো নুলিয়া, মুরহা ও সাঁসিয়া। ইংরেজ সরকার সাঁসিয়াদের অপরাধ প্রবন জাতি হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের সম্পূর্ণভাবে বরবাদ করে দেয়।

নতুন সমাজ যেমন পুকুর থেকে সরে আসতে লাগালো, তেমন তেমনই ভুলতে

লাগলো পকুর যাঁরা তৈরী করতেন তাঁদেরও। এই ভুলে যাওয়ার তালিকায় স্থান পেলেন - দুসাধ, নৌনিয়া, গোণ্ড, প্রধান, কোল, ঢিমর ও ভোই। একটা সময় ছিলো যখন এঁদের পুকুর বিশেষজ্ঞ রূপে পরিচিতি ছিলো। আজ আমরা তাঁদের সেই ভূমিকাকে বুঝে ওঠার প্রয়োজনীয় বিবরণটুকুও হারিয়ে ফেলেছি।

কোরি বা কোলি জাতিও প্রচুর পরিমানে পুকুরের কাজ করেছেন। শত, শত পুকুর তৈরী করেছিলেন এই কোরি জাতি। কিন্তু এঁদের বিষয়ে সঠিক তথ্য দিতে পারে এমন একটা পংক্তিও আজ আর পাওয়া যায় না। কিন্তু একটা সময় ছিলো যখন অনেকেই তাদের এলাকাতে এই কোলি জাতির লোকেদের নিয়ে গিয়ে বসাতে চাইতেন এবং তাদের জন্য বিশেষ কিছু সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হতো। মহারাষ্ট্রের অনেক গ্রামেই তাঁদের যে জমি দেওয়া হয়েছিলো তার খাজনা লাগতো না। এ জমিগুলোকে বলা হতো 'বারা' বা 'ওয়ারে'।

সত্য সত্য লৌহ পুরুষ ছিলেন আগরিয়া। এঁদের পরিচিতি ছিলো লোহার কাজের জন্য। কিন্তু কোথাও কোথাও এঁরা পুকুরও তৈরী করতেন। পুকুর তৈরীর হতিয়ার-- গাঁইতি, টামনা, শাবল, কোদাল, পরাত, বড় লোহার কড়াই তৈরী করতেন যে মানুষগুলো, তাঁরা সেগুলো ব্যবহারেও কারো থেকে পিছিয়ে ছিলেন না।

পরিহার ও মালী সম্প্রদায়ও যুক্ত ছিলেন এই কাজের সঙ্গে। পুকুর হয়ে গেলে তাঁরা তাতে শালুক, পদ্ম প্রভৃতি লাগাতেন। কোনো কোনো জায়গায় পুকুরের ধারের কিছু জমি মালী পরিবারের জন্যই রাখা থাকতো। পুকুর থেকেই জীবিকা চলতো তাই জীবনভর তাঁরা পুকুরের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন।

ভীল, ভীলানে, লহরীয়া, কোল সবকিছু হারিয়ে আজ তপশিলী উপজাতি তালিকাভুক্ত হয়েছেন। কিন্তু একটা সময় ছিলো যখন এঁদের নিজেদের ছোট-বড় রাজত্ব ছিলো। এই রাজত্বে পুকুরের, জলের সব ব্যবস্থা তাঁরা নিজেরা করতেন। বেগবতী নদীর জলকে কোথায় আটকাতে হবে, কেমনভাবে সেখানে বাঁধ দিতে হবে, সে জলকে সেচের জন্য কতদূর নিয়ে যেতে হবে -- এসব কৌশল ভীল-দের কাছে ছিলো খুবই সাধারণ। যেন তাঁর নিজের কাঁধে রাখা তীর ধনুক। নদীর ওপর দেওয়া বাঁধ ও পুকুরের জলের চাপও তাঁরা খুব ভালো বুঝতেন। জলে কতটা চাপ রয়েছে, এই চাপে জল কতদূর পর্যন্ত গিয়ে কুয়োগুলোকে ভরাতে পারবে তীর দিয়ে গণ্ডী কেটে ভীল তা বলে দিতেন পারতেন।

রাজস্থানে এই কাজটাই করতো মীনা। আলোয়ার জেলার একটি সংস্থা 'তরুণ ভারত সংঘ' গত কুড়ি বছরে সাড়ে সাত হাজারেরও বেশী পুকুর তৈরী করিয়েছে। প্রতিটি গ্রামে গিয়েই তাঁদের মনে হয়েছে পুরো গ্রামই পুকুর তৈরী করতে জানে। তাই

পুকুর তৈরী সংক্রান্ত কোন সমস্যাতেই সংস্থাকে বাইরের কারো কাছে পরামর্শের জন্য ছুটতে হয়নি। কেননা গ্রামের ভেতর যে মীনা সম্প্রদায়ের পাড়া ছিলো, যাঁরা পুকুর তৈরী করে এসেছেন পুরুষানুক্রমে।

ভীলদের মধ্যে কিছু প্রকারভেদ রয়েছে। নায়ক, নায়কা, চৌলিওয়ালা নায়ক, কাপড়িয়া নায়ক, বড় নায়ক, ছোট নায়ক, এছাড়াও তলারিয়া, গরাসিয়া - সকলেই পুকুরের কাজে নায়ক।

মহারাষ্ট্রের নায়ক বা কোঙ্কনের নাইক উপাধি বাঞ্জারাদের মধ্যে পাওয়া যেতো। বনে বনে ঘুরে বেড়াতেন বনচর, বিনচর - এরপর ধীরে ধীরে তাঁরা বাঞ্জারা হয়ে গেলেন। এখন এঁদের দয়ার পাত্র করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু একটা সময় ছিলো যখন এঁরা কয়েকশো পশুর পিঠে জিনিসপত্র চাপিয়ে এক শহর থেকে আর এক শহরে বাণিজ্যে বেরিয়ে পড়তেন। আখের এলাকা থেকে গুড় নিয়ে যেতেন ধানের এলাকায়, ধানের এলাকা থেকে অন্য কোন এলাকায়।

শাহ্‌জাহানের উজির আসফজাহান যখন ১৬৩০ সালে দক্ষিনে আসেন তখন তার জিনিসপত্র বয়ে আনার জন্য ভঙ্গী-জঙ্গী নামক এক নায়ক বাঞ্জারার পশুর পাল-ই ব্যবহার করা হয়েছিলো। পশুর সংখ্যাটা বড় একটা কম ছিলো না, এক লাখ চল্লিশ হাজার। ভঙ্গী-জঙ্গী ছাড়া শাহি সৈন্যবাহিনী নড়তেও পারতো না। নায়কের প্রশংসায় আসফজাহান তাঁকে সোনায় লেখা এক তাম্রপাত্র উপহার দেন।

বর্ণনাতে অতিশয়োক্তি থাকতে পারে, কিন্তু বাঞ্জারাদের পালে এত পশু থাকতো যে গোণা কঠিন। তাই এটাই প্রচলিত ছিলো — 'এক লাখ পশুর পাল'। আর এই টোলার নায়ককে বলা হতো লাখা বাঞ্জারা। হাজার হাজার পশুর পাল নিয়ে কয়েকশো মানুষ বেরিয়ে পড়তেন। এঁদের একদিনের বিশ্রামে কতটা জলের প্রয়োজন হয় আন্দাজ করা যায়। যেখানে এঁরা পৌছাতেন সেখনে যদি পুকুর না থাকতো তো সেখানে পুকুর খোঁড়াটা তাঁরা তাঁদের কর্তব্য বলে মনে করতেন। মধ্যপ্রদেশের সুন্দর সুন্দর বড় পুকুরগুলি এরকমই কোন লাখা বাঞ্জারার তৈরী। ছত্রিশগড়ের অনেক গ্রামের লোকই নিজেদের পুকুরগুলির সঙ্গে কোনো না কোনো লাখা বাঞ্জারাকে স্মরণ করেন। এই অজ্ঞাত লাখা বাঞ্জারাদের হাতে তৈরী জ্ঞাত পুকুরগুলির তালিকাতে কয়েকটি প্রদেশের নামই ঢুকে পড়বে।

গোন্ড সমাজেরও গভীর সম্পর্ক ছিলো পুকুরের সঙ্গে। মহাকৌশলে গোন্ডদের এই গুণ জায়গায় জায়গায় পুকুর রূপে ছড়িয়ে রয়েছে। জব্বলপুরের কাছে কুড়ন যে পুকুর তৈরী করেছিলেন আজ প্রায় এক হাজার বছর পরও তা পরিষেবা দিয়ে চলেছে। এই সমাজেরই রানী দুর্গাবতী, নিজের ছোট্ট জীবনকালের একটা বড় অংশ পুকুরে

ভরিয়ে নিয়েছিলেন।

গোন্ডরা যে শুধু নিজেরা পুকুর করতেন তাই নয়, অন্য যাঁরা পুকুর করতেন তাঁরা তাঁদের যথেষ্ট সম্মানও দিতেন। গোন্ড রাজারা খুব উৎসাহের সঙ্গে কোহলী সমাজের লোকেদের এনে ভান্ডারা জেলাতে বসিয়ে ছিলেন। এজন্য ভান্ডারাতেও খুব ভালো পুকুর পাওয়া যায়।

বড় পুকুরের গুণতিতে সব থেকে প্রথমে আসে যে প্রসিদ্ধ 'ভূপাল তাল', তা তৈরী করিয়েছিলেন রাজা ভোজ কিন্তু কালিয়া নামক কোন এক গোন্ড সর্দারের সাহায্যেই তার রূপরেখা সম্পূর্ণ হতে পেরেছিলো। ভূপাল ও হোসঙ্গাবাদের মাঝের ঘাটিতে বয়ে যাওয়া কালিয়াসোত নদী এই গোন্ড সর্দারের নামেই স্মরণ করা হয়।

ওড়িয়া, ওড়হি, ওড়, ঔড় - জায়গা অনুসারে নাম পাল্টেছে। কাজ সেই একই রাত্রি-দিন কুয়ো-পুকুর তৈরী করা। এত, যে গোণা সম্ভব ছিল না। তাই প্রবাদে পরিণত হয়েছিলো - 'ওড় প্রতিদিন নতুন কুয়োর জল পান করে।' যাঁরা তৈরী করতেন ও যা তৈরী হতো এই দুইয়ের একাকার হয়ে যাওয়ার এর থেকে বড় উদাহরণ সম্ভবত আর হয় না। কুয়োর আরও এক নাম যে 'ওড়'। ওড়রা পশ্চিমে গুজরাত থেকে রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ বিশেষ-ভাবে বুন্দেলশহর ও তার আশ-পাশের এলাকা, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিলো। এঁদের সংখ্যাও সম্ভবত ভালই ছিলো। উড়িষ্যায় কখনও কোন সমস্যা হওয়ায়, নয় লক্ষ ওড়িয়া ধার নগরীতে উঠেছিলেন বলে গল্প প্রচলিত রয়েছে। এঁরা গাধা পালতেন। কোথাও গাধা দিয়ে মাটি বহিয়ে পাড় তৈরী করতেন তো কোথাও মাটি খুঁড়তেন। সাধারণত স্ত্রী-পুরুষ একই সঙ্গে কাজ করতেন। ওড়িয়া খুব ভালো মাটি চিনতেন। রং ও গন্ধে তাঁরা মাটির স্বভাব পড়ে ফেলতে পারতেন। মাটির উপরিতল ও চাপও তাঁরা খুব ভালো বুঝতেন। রাজস্থানে প্রবাদ রয়েছে - 'ওড়িয়া কখনও মাটি চাপা পড়ে মরে না।'

গোন্ড সমাজেরও
গভীর সম্পর্ক ছিলো পুকুরের সঙ্গে।
মহাকৌশলে গোন্ডদের এই গুণ, জায়গায়
জায়গায় পুকুর রূপে ছড়িয়ে রয়েছে।
জব্বলপুরের কাছে কুড়ন
যে পুকুর তৈরী করেছিলেন
আজ প্রায় এক হাজার বছর পরও তা
পরিষেবা দিয়ে চলেছে।
এই সমাজেরই রানী দুর্গাবতী,
নিজের জীবনকালের একটা বড়
অংশ পুকুরে ভরিয়ে নিয়েছিলেন।

প্রসিদ্ধ লোকনায়িকা 'জসমা ওঢ়ন' ধার নগরীর এই রকমই কোন একটা পুকুরে কাজ করছিলেন। রাজা ভোজ তাঁকে দেখে এমনই মুগ্ধ হন যে রাজ্য-পাট পর্যন্ত ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। রাজার চোখে জসমা ছিলেন অপ্সরা। সোনায় তৈরী অপ্সরা বললে বোধহয় ভালো হয়। কিন্তু নিজেকে, নিজের শরীরকে এমন কি এই সংসারকেও মাটি মনে করে যে পরম্পরা , জসমা ছিলেন সেই পরম্পরারই অংশ বা ধারা। কাহিনী বলে - রাজা জসমাকে পাওয়ার জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত ছিলেন। নিজের কর্তব্য ছেড়ে যা করার নয় তাই তিনি করছিলেন। জসমা এই রকম রাজার রানী হওয়ার আগে মৃত্যুবরণ করার সিদ্ধান্ত নেন্। রাজার নাম মুছে গেছে কিন্তু জসমা ওঢ়নের যশ আজও উড়িষ্যা থেকে শুরু করে ছত্রিশগড়, মহাকৌশল, মালওয়া, রাজস্থান ও গুজরাতে ছড়িয়ে রয়েছে। কয়েকশো বছর পেরিয়ে গেছে তবুও এই এলাকায় ফসল কাটার পর এখনও জসমা ওঢ়নের গান গাওয়া হয়, নাটক হয়। ভবই-এর মঞ্চ থেকে শুরু করে ভারত ভবন, রাষ্ট্রীয় নাটক বিদ্যালয়ে পর্যন্ত জসমার চরণ পড়েছিলো।

জসমা ওঢ়নের যশ তো মানুষ মনে রেখেছে কিন্তু ওঢ়হিদের কুয়ো, পুকুর তৈরীর যশ মানুষ ভুলে গেছে। যাঁরা সত্যি সত্যিই রাষ্ট্র-নির্মাতা ছিলেন তাঁদের অনিশ্চিত রুজি রুটির সন্ধানে ঘুরে বেড়তে বাধ্য করা হলো। তবুও ওঢ়হি আজও এই কাজই করে - 'ইন্দিরা নহর' তৈরী করতে হাজার হাজার ওঢ়হি কাজে লেগেছিলো। তবে তাঁদের সম্মান চলে গেছে আগেই।

উড়িষ্যাতে ওঢ়হিরা ছাড়াও সোনপুরা ও মহাপাত্ররাও পুকুর কুয়োর নির্মাতা ছিলেন। এঁরা গঞ্জাম, পুরী, কোনারক ও তার আশপাশের এলাকায় ছড়িয়ে ছিলেন। বোলঙ্গি জেলার সোনপুর গ্রাম থেকে আসেন সোনপুরারা। এঁরা একদিকে মধ্যপ্রদেশ ও অন্যদিকে অন্ধ্র পর্যন্ত পৌছান। খরিয়া জাতি রামগড়, বিলাশপুর ও সরগুজার আশপাশে পুকুর, ছোট বাঁধ ও নহরের কাজ করতেন। ১৯৭১-এর আদমসুমারীতে এঁদের জনসংখ্যা পাওয়া যায় তেইশ হাজার।

বিহারে মুসহর, বিহার সংলগ্ন উত্তরপ্রদেশের কিছু অংশে লুনিয়া, মধ্যপ্রদেশে নৌনিয়া, দুসাধ ও কোল জাতিও পুকুর তৈরীতে মগ্ন থাকতেন। সেই সময় মুসহর, লুনিয়া বা নৌনিয়ারা আজকের মতো দুর্দশাগ্রস্ত ছিলেন না। আঠারশো শতাব্দী পর্যন্তও পুকুর সম্পূর্ণ হলে মুসহরদের উচিত পারিশ্রমিকের সঙ্গে জমিও দেওয়া হতো। লুনিয়া নৌনিয়ার পুজা করা হতো পুকুর শেষ হলে। মাটি পরীক্ষক মুসহরদের সমাজে একটা স্থান ছিলো। কোন এক সময় তাঁদের এক শক্তিশালী নেতা ছিলেন চোহরমল। শ্রীসলেষ (শৈলেশ) দুসাধদের পূজনীয় ছিলেন। শুধু দুসাধই নন্, অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেদের

কাছেও ইনি সম্মানিত ছিলেন। দুধাস যখন শ্রীসলেষ-এর যজ্ঞ করে তখন অন্য জাতির লোকেরাও তাতে অংশগ্রহণ করেন। এঁনার গান বিভিন্ন জায়গায় গাওয়া হতো।

এই অঞ্চলেই এক সময় ডাঢ়ি নামে এক জাতি বাস করতেন। এঁদের প্রসিদ্ধি ছিলো কঠিন পরিশ্রমের কাজের জন্য। কুয়ো পুকুরের কাজ অবশ্য এই তালিকাতেই ছিলো। বিহারে যদি আজও কোন কঠিন পরিশ্রমের কাজ করতে পারা না যায় তখন বলা হয় 'ডাঢ়ি লাগিয়ে দাও'। ডাঢ়িদের শরীর যেমন মজবুত ছিলো শারীরিক গঠনও ছিলো ততটাই সুন্দর। এঁদের সুডৌল, সুঠাম শরীরের পেশী দেখার মতো ছিলো।

বর্তমান বিহার, ঝাড়খন্ড ও বাংলায়[১] বসবাসকারী সাঁওতালরাও খুব সুন্দর পুকুর তৈরী করতেন। সাঁওতালদের এই কুশলতাকে মনে করিয়ে দেবার জন্যই সাঁওতাল পরগণায় অনেক কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পরও কিছু 'আহর' (পুকুর) আজও বেঁচে রয়েছে।

'কোহলিয়'-দের হাতে মহারাষ্ট্রের নাসিকে এত পুকুর ও বাঁধ হয়েছিলো যে এই অংশে দুর্ভিক্ষের ছায়া পর্যন্ত পড়তো না। সমুদ্রতীরবর্তী কোঙ্কন ও গোয়াপ্রদেশে ঘনঘোর বর্ষা হয় এবং দেখতে না দেখতেই বৃষ্টির মিষ্টি জল সমুদ্রের নোনা জলের সঙ্গে গিয়ে মেশে। কিন্তু পশ্চিমঘাট পাহাড়ের ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত বিভিন্ন পুকুরে এই বৃষ্টির জলকে ধরে রাখা হতো। এই কুশলতা ছিলো 'গাউড়ী' জাতির। কর্ণাটকের উত্তরী কন্নড় অঞ্চলে 'চীরে' নামের এক প্রকার পাথর পাওয়া যায়। প্রবল বৃষ্টির জলপ্রবাহকে এই চীরে পাথর দিয়ে বাঁধা যায়। চীরে পাথর খাদান থেকে তুলে এনে একটা নির্দিষ্ট আকারে সেটাকে কাটা হয়। এই নির্দিষ্ট আকারের এক রতিও এদিক ওদিক হয় না।

এত ব্যবস্থা সম্মত কাজ, ব্যবস্থা সম্মত পরিকল্পনা ছাড়া হওয়া সম্ভব ছিলো না। বুদ্ধি ও সংগঠনের যুগলবন্দী ছাড়া এত পুকুর তৈরী হওয়া সম্ভব ছিলো না, এত দিন টিঁকেও থাকতো না। দক্ষিণের দিকে তাকালেই বুঝতে পার যায় এই সংগঠন কত সতেজ ও স্বতঃস্ফূর্ত ছিলো।

দক্ষিণে সেচের জন্য যে পুকুর তাকে বলা হতো 'এরি'। গ্রামে গ্রামে এরি ছিলো এবং উপেক্ষার দুশো বছর পার করে হাজার হাজর এরি আজও পরিষেবা দিয়ে চলেছে। গ্রামের পঞ্চায়েতের ভিতরই আরও একটা সংস্থা থাকতো 'এরি ওয়ার্যাম'। এরি ওয়ার্যামে গ্রামের ছয়জন সদস্য নিযুক্ত হতেন এক বছরের জন্য। এরি সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রকার কাজ - এরি তৈরী করা, তার রক্ষণাবেক্ষণ, সেচের ন্যায়- নিরপেক্ষ ব্যবস্থা, এইসব কাজের জন্য জিনিসপত্র যোগাড় করা ওয়ার্যামের জিম্মায় থাকতো। ওয়ার্যামের ছয় সদস্য যদি ঠিকমতো কাজ না করতেন তাহলে তাঁদের নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সরানো যেতো।

এরি তৈরীর কাজ করতেন বোদ্‌দার। সম্পূর্ণ সেচব্যবস্থার জন্য একটি পদ নির্দিষ্ট থাকতো। এটি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিলো। যেমন - নীরঘন্টি, নীরগন্টি, নীরয়ানি, কম্বকক্‌টি, মাইয়োনথোটটি প্রভৃতি। পুকুরে কত জল আছে, কত জমিতে সেচ হবে, জল বন্টন ব্যবস্থা কিভাবে করা হবে — তার ব্যবস্থা করতো নীরঘন্টি। নীরঘন্টির পদ শুধুমাত্র হরিজনদেরই দেওয়া হতো ও সেচের ব্যপারে নীরঘন্টির মত-ই ছিলো সর্বোচ্চ। কৃষক, সমাজে যত বড়ই স্থানাধিকারী হোন না কেন এই ব্যপারে তাঁকে নীরঘন্টির তুলনায় ছোটই মনে করা হতো।

একদিকে নীরঘন্টিদের মতো হরিজন যেমন ছিলেন, পশ্চিমে তেমনি পালীওয়াল ব্রাহ্মনেরাও একাজ করতেন। দশম শতাব্দীতে জয়সলমের, যোধপুর-এর পল্লী নগরে বসবাস করতেন বলে এদের পল্লাওয়ালা বা পলীওয়াল বলা হতো। পলীওয়াল ব্রাহ্মনেরা মরুভূমিতে বর্ষিত অল্প একটু জলকেও ধরে রাখার অপূর্ব কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন। এঁরা সুন্দর খডিন তৈরী করতেন। খডিন প্রধানত পুকুরই। মরুভূমির এমন একটা বড় অংশ যেখানে জল বয়ে আসে, তার দুই বা তিনদিকে আল দিয়ে জল আটকে বিশেষভাবে তৈরী বাঁধের মতো ক্ষেত্রকে খডিন বলে। মরুভূমিতেও একশো মণ আনাজ এই খডিন থেকেই উৎপাদন করা হয়েছে। আজও জয়সলমের, বড়মের, যোধপুর এলাকায় কয়েকশো খডিন পাওয়া যাবে।

জলের কাজে র এই প্রসিদ্ধি ছাড়াও আত্মাভিমান যে কি জিনিস তার মূর্ত উদাহরণ হতে পারেন পালীওয়াল ব্রাহ্মণরা। জয়সলমেরে না জানি কত গ্রাম ছিলো এঁদের। কোন কারণবশতঃ রাজার সঙ্গে পালীওয়ালদের বিরোধ বাঁধে। রাতের মধ্যেই পলীওয়ালদের গ্রাম খালি! সুন্দর সুন্দর ঘর, কুয়ো, খডিন ফেলে রেখে তাঁরা রাজ্যের বাইরে চলে যান। জয়সলমের পর্যটন গাইড আজ বড় গর্বের সঙ্গে পালীওয়ালদের গ্রামগুলি দেখায়। সেখান থেকে বেরিয়ে তাঁরা কোথায় যে যান তার ঠিক আন্দাজ পাওয়া যায়নি তবে একটা বড় অংশ জৈনপুর ও আগ্রায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেন।

মহারাষ্ট্রে চিতপাবন ব্রাহ্মণরাও পুকুর তৈরীর কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু অন্যান্য কিছু ব্রাহ্মণদের এটা ভালো লাগলো না যে ব্রাহ্মণরা মাটি কাটা, বওয়া - এই সমস্ত কাজ করে। বাসুদেব চিতেল নামে এক চিতপাবন ব্রাহ্মণ সম্পর্কে লোককথা রয়েছে - বাসুদেব কিছু কুয়ো, পুকুর ও বাউড়ি তৈরী করেন। একদিন তিনি পরশুরাম ক্ষেত্রতে একটা পুকুরে কাজ করছিলেন। সঙ্গে আরও অনেকেই কাজ করছেন - দেবরুখ থেকে আসা এক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় এর বিরোধীতা করে। বাসুদেব তাদের অভিশাপ দেন, 'যে ব্রাহ্মণ তোমাদের সঙ্গ দেবে তারা তেজহীন হয়ে লোকের নিন্দার পাত্র হবে।' সেই চিতপাবনের অভিশাপের পর তাদের বলা হয় 'দেবরুখ' ব্রাহ্মণ।

নায়কদের হাতিয়ারগুলিও পূজ্য হয়ে উঠত

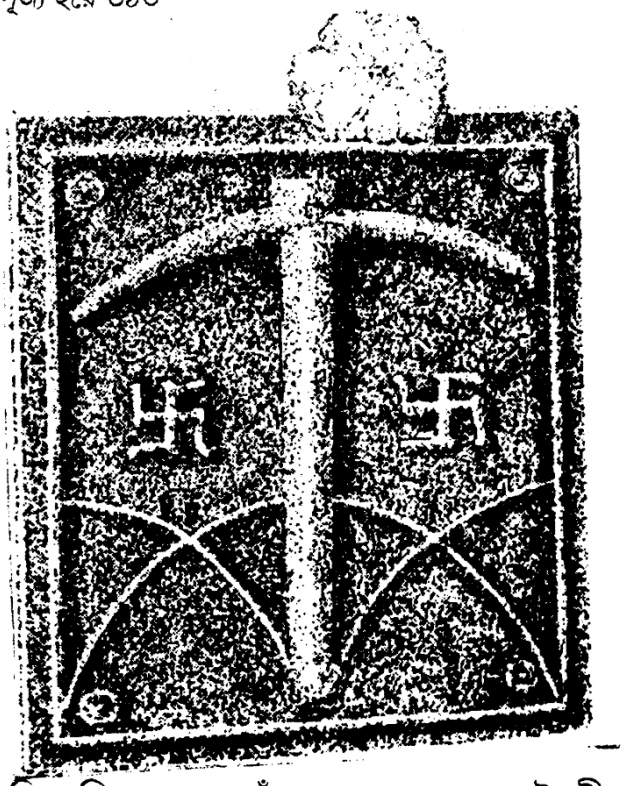

দেবরুখ ব্রাহ্মণ তেজহীন হয়েছিলো নাকি লোক নিন্দনীয় হয়েছিলো তা জানা যায় না। তবে চিতপাবন ব্রাহ্মণরা নিজের এলাকায় বা দেশেও প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজের পরিচিতি তৈরী করতে পেরেছেন। বলা হয়ে থাকে পুষ্করনা ব্রাহ্মনরাও সমাজে ব্রাহ্মনের মর্যাদা পেয়েছিলেন পুকুরেরই জন্য। জয়সলমেরের কাছে পোখরানে বসবাসকারী এঁরা সকলেই পুকুর তৈরীর কাজ করতেন। প্রসিদ্ধ তীর্থ পুষ্করদেবের পুকুর তৈরীর কাজ এঁদেরই অর্পণ করা হয়েছিলো। বালি দিয়ে ঘেরা খুব কঠিন জায়গায়, দিনরাত্রি পরিশ্রম করে এঁরা খুব সুন্দর পুকুর তৈরী করেন। পুকুর যখন ভরে ওঠে তখন প্রসন্ন হয়ে তাঁদের ব্রাহ্মণের মর্যাদা দেওয়া হয়। এখানে এখনও পুষ্করণ ব্রাহ্মণদের কোদালরুপী মূর্তি পূজা করা হয়।

ছত্রিশগড়ে রামনামীরা পুকুর বিষয়ে খুব অভিজ্ঞ ছিলেন। এঁরা সারা শরীরে রামনামের উল্কি করাতেন। গায়ে যে চাদর দিতেন তাতেও লেখা থাকতো রামনাম। মাটির কাজ এঁদের কাছে রাম নাম নেওয়ারই সমতূল্য ছিলো। রায়পুর, বিলাসপুর ও রায়গড়ে ছড়িয়ে থাকা এই সম্প্রদায়ের লোকেরা ঘুরে ঘুরে পুকুর খুঁড়তেন। সম্ভবত এই ঘুরে বেড়ানোর জন্যই তাঁরা বাঞ্জারার পরিচিতি পেয়েছিলেন। ছত্রিশগড়ে এমন আনেক গ্রাম পাওয়া যাবে, যেখানে গ্রামবাসীরা বলেন তাঁদের পুকুর করেছিলেন বাঞ্জারারা। রামনামী পরিবারগুলি হিন্দু ছিলেন, কিন্তু অন্তিম সৎকারে দাহ না করে তাঁরা সমাধি দিতেন। কেননা রামনামীদের কাছে মাটির থেকে বড় কিছুই নয়। জীবনভর রামের স্মরণ নিয়ে পুকুরের কাজ করে যাওয়া এই মানুষগুলির জীবনের পূর্ণ বিশ্রামের জন্য এর থেকে পবিত্র রীতি কী-ই আর হতে পারে!

এ সমস্ত নাম আজ হারিয়ে গেছে। তাঁদের নামগুলি স্মরণ করার জন্যই এই নাম-মালা। তবে গজধর থেকে শুরু করে রামনামী এই যে মালা, এ মালাও পূর্ণ নয়, বড়জোর আংশিক। সব জায়গাতেই পুকুর হতো এবং সব জায়গাতেই তা করার লোকও ছিলেন।

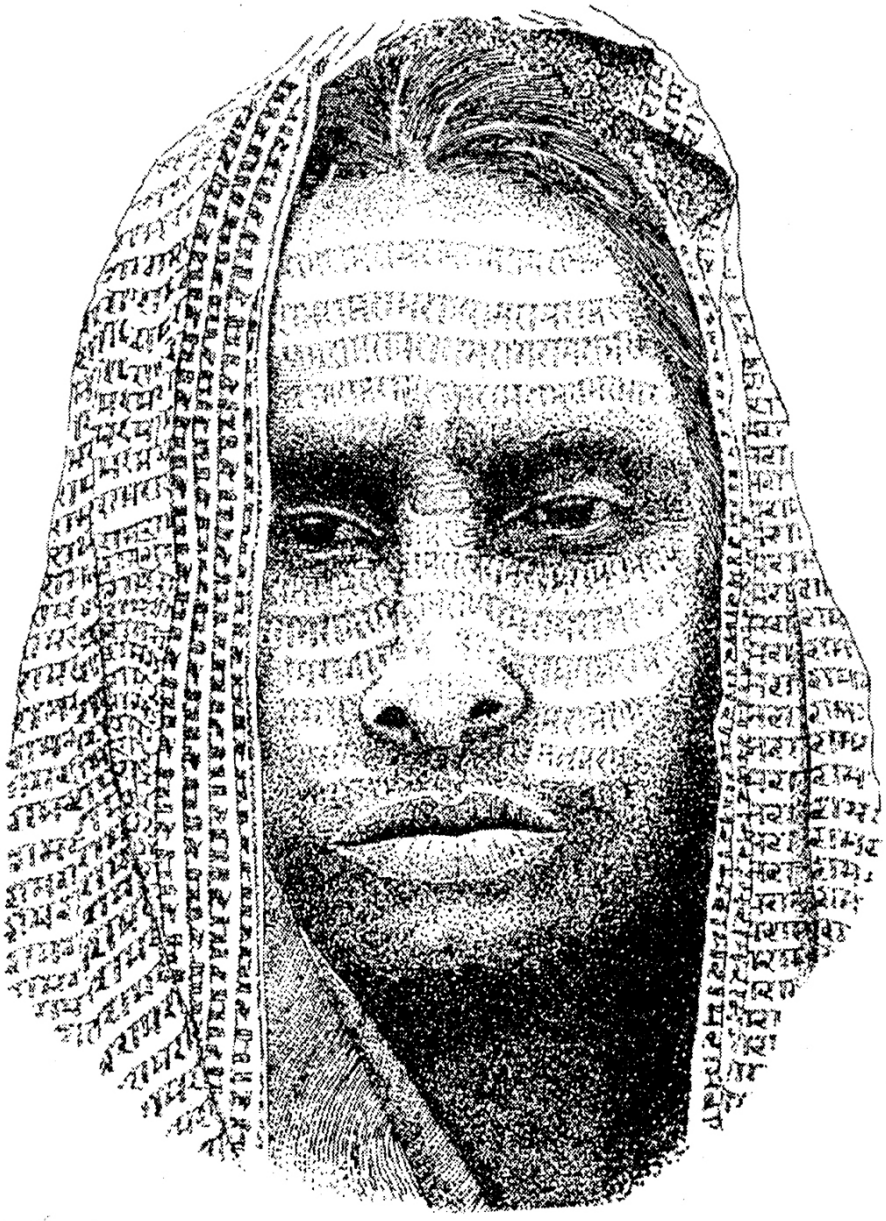

রামনামা: মাটির কাজ
এঁদের কাছে
রামনাম-এরই সমতূল্য

শত-শত, হাজার-হাজার পুকুর শূন্য থেকে প্রকট হয়নি। কিন্তু সেগুলি যাঁরা তৈরী করেছিলেন তাদের পরিচয় আজ শূন্যে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১। এছাড়াও বাংলায় মুণ্ডা, খেড়িয়ারাও পুকুরের কাজ করতেন। তবে বাংলায় পুকুর তৈরীতে সবথেকে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন 'মুদী'। এখনও মুদী ছাড়া পুকুর প্রতিষ্ঠা হয় না।

সাগরের আগর

পুকুর নিজেই এক বড় শূন্য।

কিন্তু পুকুর পশুদের খুরে তৈরী হওয়া এমন কোন গর্ত নয় যা বৃষ্টির জলে নিজে নিজেই ভরে উঠবে। এই শূন্যটিকে ভেবেচিন্তে সূক্ষ্মভাবে তৈরী করা হয়। ছোট-বড় সকল পুকুরেরই কয়েকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রয়েছে এবং প্রত্যেকটিরই একটি বিশেষ কাজ এবং বিশেষ নামও। এই নাম পুকুরের সঙ্গে সঙ্গে পুকুর প্রস্তুতকারী সমাজের ভাষা এবং রুচির সমৃদ্ধির প্রমাণ দেয়। কিন্তু সমাজ যেমন ধীরে ধীরে পুকুর বিষয়ে গরীব হতে লাগলো, ভাষা থেকে সে সব শব্দ, নাম উঠে যেতে লাগলো।

মেঘ ওঠে ঘন হয়ে বৃষ্টি আসে, আর বৃষ্টি যেখানে পড়লো, সেখানে এমন একটা জায়গা থাকে যেখানে জল ধরে। একটা প্রক্রিয়া হলো - 'আগৌরনা', অর্থাৎ একত্র করা। এর থেকেই এসেছে আগৌর। আগৌর পুকুরের এমন অঙ্গ, যেখান থেকে পুকুরে জল আসে। এটা এমন ঢাল যেখানে বর্ষার জল একদিকে গড়িয়ে আসে। এর অপর এক নাম 'পানঢাল'। মধ্যপ্রদেশের কিছু জায়গায় আগৌরকে পৈঠু, পৌরা বা পৈন বলে। আর বই, খবরের কাগজ ও বিভিন্ন সংস্থাগুলিতে মিলে এই অঙ্গটির জন্য একটি নতুন শব্দ চালু করেছে - 'জলাগমক্ষেত্র'। শব্দটি ইংরাজী ক্যাচমেন্ট শব্দ থেকে অনুবাদ করা। বানানো। একদিক থেকে ভুলও। সংস্কৃতে 'জলাগম'-এর অর্থ বর্ষা ঋতু।

যেখানে জল এসে ভরবে তাকে পুকুর বলে না, তা হলো 'আগর'। পুকুরতো হলো সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আগাগোড়া যোগফল। আগর অর্থাৎ ঘর, কোষাগার[১]। পুকুরের এই কোষাগার হলো আগর, সেখানে সবটুকু জল এসে জমা হবে। রাজস্থানে পুকুর ছাড়া অন্যত্রও এই শব্দটির ব্যাবহার দেখতে পাওয়া যায়। রাজ্য পরিবহণ বাসডিপোকেও আগর বলে। আগরা নামও আগর থেকে এসেছে। আগর নামে অনেক গ্রামও পাওয়া যাবে।

আগৌর ও আগর হলো পুকুরের দুটি প্রধান অঙ্গ। আলাদা আলাদা জায়গায় এগুলির আলাদা নামও রয়েছে। অনেক জায়গায় দেখা যায় এই শব্দগুলি মূল সংস্কৃত

থেকে সরতে সরতে সহজ মুখের ভাষায় পরিণত হয়েছে আবার কোথাও এমন কি প্রকৃত গ্রামীণ এলাকাতেও মুখের ভাষাকে সংস্কৃত পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আগর কোথাও আব, তো কোথাও পয়তান অর্থাৎ যেখানে পুকুরের পা ছড়িয়ে রয়েছে। যেখানে এই ছড়িয়ে থাকা অংশ গুটিয়ে যায় তা হলো আয়তন অর্থাৎ আগর। একে কিছু জায়গায় ভরাও বলা হয়। অন্ধ্রপ্রদেশে পৌঁছে এ আবার হয়েছে পরিবার প্রদেশম্। আগৌর থেকে জল আসে আগরে। কোথাও আবার আগরের মাঝামাঝি কুয়োও খোঁড়া হয় এবং এই স্রোতেই পুকুরে জল হয়। একে বলা হয় 'বোগলি'। বিহারে এই রকম শত শত পুকুর রয়েছে বোগলি করা। বোগলির আরও এক নাম - চুহর।

জলের আগরকে তথা মূল্যবান কোষাগারকে রক্ষা করবে পাড় বা পাল্। পাল শব্দ সম্ভবত পালক শব্দ থেকে এসেছে। আকারে ছোট হলে ভীঁগু। বিহারে ভীঁগু-কে ভিঁগু ও বলা হয়। কোথাও আবার 'মহার'। 'পুশ্তা' শব্দ বোধহয় পরে এসেছে। কিছু জায়গায় এটা আবার পার। নদীর পারের মতই ধারের অর্থে। পারের সঙ্গে আরও রয়েছে - আর; পার ও পুকুরের এই পার থেকে ঐ পারকে আর-পার অথবা পার-আর, বদলে পারাওয়ার বলা হয়। আজ পারাওয়ার শব্দ পুকুর বা জল থেকে সরে গিয়ে আনন্দের মাত্রা বোঝাতে ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু প্রথমে এটি আনন্দেরই পারাওয়ার ছিলো বোধহয়।

পাড় বা পাল মজবুত হবে, কেননা সে পুকুরের রক্ষাকর্তা। তবে এই রক্ষাকর্তারও রক্ষাকারী চাই তা নাহলে আগৌর থেকে ক্রমান্বয়ে বয়ে আসা জল আগর ভরিয়ে, না জানি কখন উপচে যাবে। আর তখন জলের প্রচণ্ড শক্তি ও গতিবেগ পাড় ভেঙ্গে ফেলতে পারে। পুকুরকে এই ভাঙ্গনের হাত থেকে বাঁচায় 'অফরা'। আগর তো হলো পুকুরের পেট। এটা একটা সীমা পর্যন্ত ভরতেই হবে। তবেই তো সারাবছর পুকুরের কোন মানে হয়। আবার এই সীমা পেরিয়ে গেলেও পাড়ের বিপদ। পেট পুরোভরে গেছে, অতিরিক্ত হয়ে গেলে তা তো খালি করতেই হবে। এ কাজটি করে অফরা।

এই অঙ্গের অনেক নাম। অফরা, কোথাও কোথাও হয়ে যায় অপরা। উবরা, ওবরাও রয়েছে। সম্ভবত উবর, উবরনে, বাঁচে - বাঁচানোর অর্থ থেকে এসেছে। রাজস্থানে এ সব নামগুলোই প্রচলিত রযেছে। ভালো বৃষ্টি হয়েছে। পুকুরে এত জল হয়েছে যে অপরা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে - একে বলা হয় 'অপরা চলা'। মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশের কয়েক জায়গায় একে চাদর চলাও বলা হয়। ছত্রিশগড়ে এই অঙ্গকেই আবার বলা হয় 'ছলকা'। পাড় না ভেঙ্গে জল যেখান থেকে ছলকে বেরিয়ে যায়।

এই অঙ্গের পুরনো নাম ছিলো উচ্ছ্বাস। ছেড়ে দেওয়ার অর্থে। নিকাশ থেকে নিকাশিও বলা হয়। অবশ্য শুদ্ধ সংস্কৃত থেকে এসেছে নেষ্টা। রাজস্থানের থর এলাকার জয়সলমের, বিকানের প্রভৃতি জায়গায়, গ্রামে বা শহরে এটি এক মাত্রাও না হারিয়ে নেষ্টা নামেই প্রচলিত রয়েছে। সীমা পার করে সিন্ধু প্রদেশেও একই নাম প্রচলিত। এটি দক্ষিণে 'কালঙ্গল' তো বুলন্দেলখণ্ডে 'বগরণ' অর্থাৎ যেখান থেকে পুকুরের অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যায়।

প্রথম বছর নেষ্টা ছোট করা হয়। অর্থাৎ অনেকটা নীচে। প্রথম বছর পাড়ও জল পান করবে, কিছু ধ্বসে পড়বে সুতরাং পুকুরে বেশী জল আটকানোরলোভ করতে নেই। যদি এক বছরেই সব ঠিক হয়ে যায় তাহলে পরের বছর নেষ্টা কিছুটা ওপরে ওঠানো হয়। তখন পুকুর বেশী জল আটকাতে পারবে। নেষ্টা মাটির কাঁচা পাড়ের কম উঁচু অংশ। কিন্তু জলের প্রধান চাপটাই সহ্য করে নেষ্টা। তাই এটিকে পাকা অর্থাৎ পাথর, চুনের করা হয়। নেষ্টার পাশের দুই দিকের পাড় অর্ধবৃত্তাকার হয় যাতে জলের বেগ সেখানে ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে যায়। এই অর্ধবৃত্তাকার অঙ্গের নাম 'নাকা'। নাকা যদি পুকুরের বদলে কোন বাঁধে করা হয়, অর্থাৎ কোন ছোট নদী বা নালার প্রবাহকে

শিবসাগরের শৈল্পীক নেষ্টা

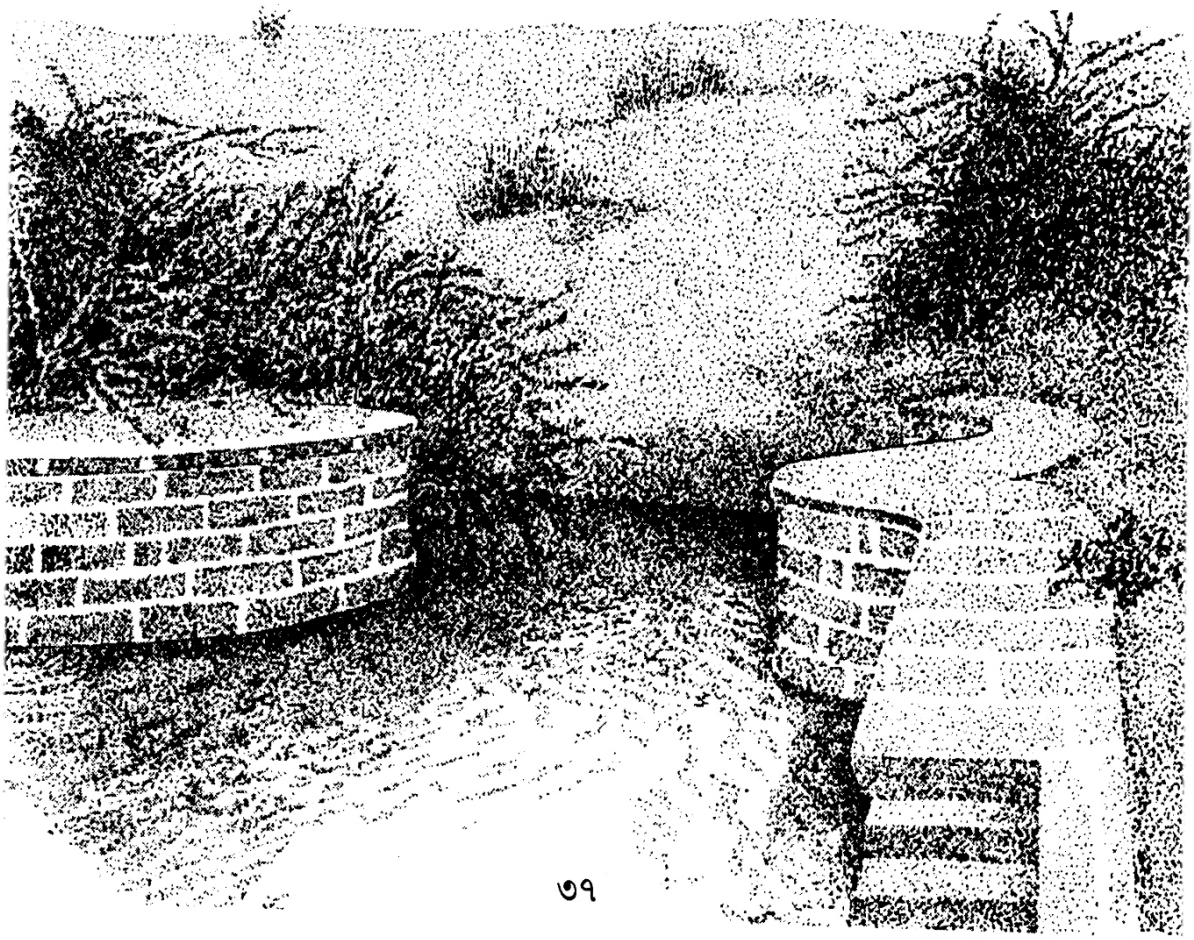

আটকানোর জন্য করা হয় তখন তাকে 'ওড়' বলে। আবার আকৃতি খানিকটা ডানার মতো হয় বলে কোথাও কোথাও একে পাখা-ও বলা হয়েছে।

নেষ্টা অবশ্যই একটি টেকনিক্যাল অঙ্গ। কিন্তু কোথাও কোথাও এমন নেষ্টাও তৈরী হয়েছে যা সব কিছু ছাপিয়ে শিল্প হয়ে উঠেছে। যে সকল সিদ্ধহস্ত গজধরদের বর্ণনা আমরা করলাম তাঁদের হাতে বারে বারে এই শিল্প সৃষ্টি হয়েছে। রাজস্থানে যোধপুর জেলার এক ছোট্ট শহর ফলৌদি। সেখানে শিবসাগর নামে পুকুর রয়েছে। এর ঘাট তৈরী করা হযেছে লাল পাথর দিয়ে। সোজা সরলরেখায় চলতে থাকা ঘাট হঠাৎই সর্পিল আকার ধারণ করে। এই আকৃতি কোন প্রকার টেকনিক্যাল গাম্ভীর্য ছাড়াই, খেলার ছলেই অতিরিক্ত জল বাইরে বার করে দিয়ে বড়ই শৈল্পিক ভাবে শিবসাগরকে রক্ষা করছে।

ফিরে আসি অগৌরে। আগৌর থেকেই জল আসে আগরে। শুধু জলই আসা চাই, বালি ও মাটিকে আটকাতে হবে। এই জন্য আগৌরের জলের ছোট ছোট ধারাগুলিকে এদিক ওদিক থেকে ঘুরিয়ে কিছু মুখ্য পথ দিয়ে আগরের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পুকুরে পৌঁছানোর অনেক আগেই এই ধারা গুলিতে খুরা লাগিয়ে দেওয়া হয়। সম্ভবত শব্দটি পশুর খুর থেকেই এসেছে। এর আকারও খুরের মতই হয়। বড় বড় পাথর এমন ভাবে জমানো হয় যে তার মাঝ দিয়ে শুধু জলই বেরিয়ে আসে মাটি, বালি পিছনে জমা হয়ে যায়। আলাদা হয়ে যায়।

মরুভূমি অঞ্চলে বালির মাত্রা সমভূমি অঞ্চল থেকে অনেক বেশী। তাই মরুভূমিতে খুরা অনেক বেশী বাস্তবসম্মত। কাঁচার বদলে পাকাও করা হয়। পদ্ধতিগতভাবে পাথরের গারা চুন দিয়ে জমিয়ে একটা ছোট্ট মতো দোতলা পুল তৈরী করা হয় যাতে ওপরের তলার জানালা বা ছিদ্র দিয়ে জল আসে।

এই ছিদ্রের নীচে এক নালা যায়। এখানে সমস্ত ভার (বালি, কাঁকর, মাটি প্রভৃতি) ফেলে রেখে পরিষ্কার জল, পরের তলার ফুটো দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আগরের দিকে এগিয়ে চলে। কয়েক প্রকার উঁচু-নীচু, ছোট-বড় ছিদ্র দিয়ে জল ছেঁকে আগরে পাঠানোর এই প্রক্রিয়াকে ছেদি বলে।

এইভাবে আটকে রাখা বালি, মাটিরও কয়েক প্রকার নাম দেওয়া হয়েছে। কোথাও এ সাদ, কোথাও পাদ, কোনখানে লদ্‌দি, তো কোথাও তলছট। সমস্ত সাবধানতা নেওয়ার পরও প্রতি বছরই জলের সঙ্গে কিছু না কিছু মাটি এসে আগরে পড়ে। এই মাটি বার করারও বাস্তব সম্মত উপায় ও সময় রয়েছে। সেকথা পরে। এখন একবার

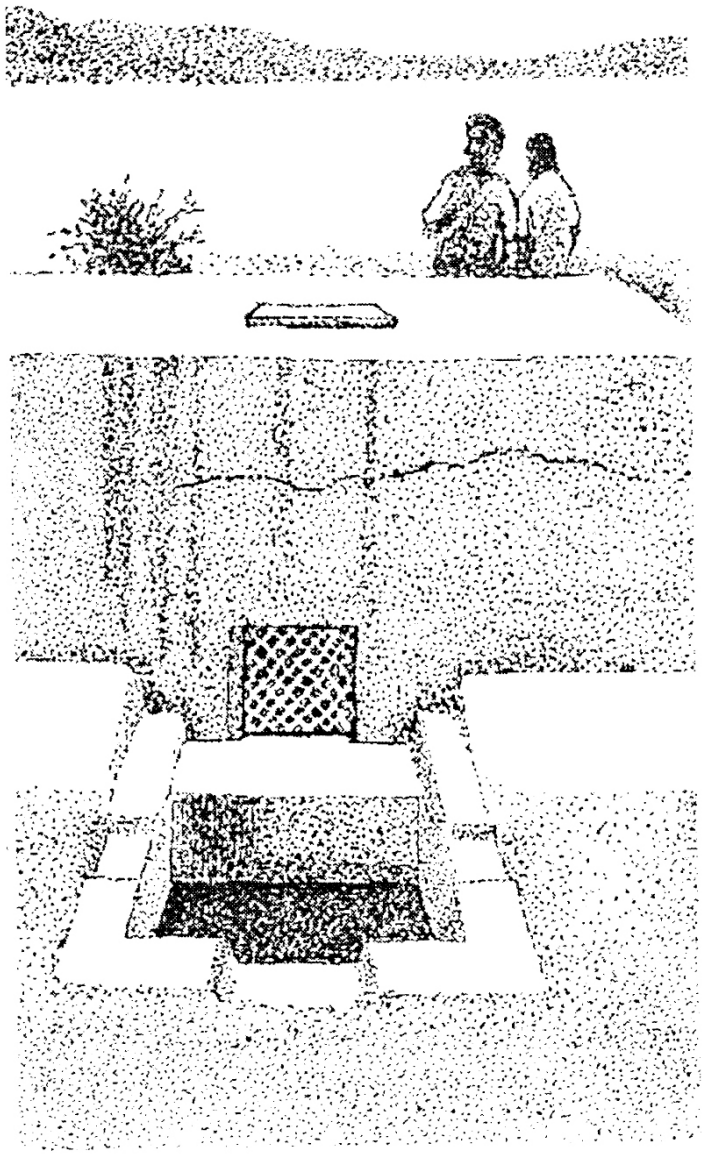

কুন্ডি

পাড়ে যাওয়া যাক। পাড় কোথাও সোজা, কোথাও অর্ধচন্দ্রাকার, কোথাও আবার দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো করা হয়। কোথাও তাতে আমদের হাতের কনুই-র মতো মোড় থাকে। এই মোড়কে কোহনী বলে। আগৌর থেকে আসা জল পাড়ের যেখানে ধাক্কা লাগাতে পারে সেখানে পাড়ের শক্তি ও স্থায়িত্ব বাড়াতে কোহনি দেওয়া হয়।

যেখানে সম্ভাবনা ও সামর্থ আছে সেখানে পাড় ও জলের মাঝখানে পাথরের পাট লাগানো হয়। পাথর যে পদ্ধতিতে জোড়া দেওয়া হয় তাকে জুহানা বলে। ছোট পাথর গারায় জোড়া হতো আর সেই গারার মধ্যে বালি, চুন, বেল, (বেলপাতা) গুড়, গঁদ, মেথি মেশানো হতো। কোথাও কোথাও ধুনোও। বড় ভারী পাথর জোড়া দেওয়া পদ্ধতি ছিলো কিল ও ছেদ। একটা বড় পাথরে ছেদ বা ফুটো করে দ্বিতীয়টাতে ঐ আকারেরই কিল তুলে দেওয়া হতো। কখনও কখনও বড় পাথর জোড়া দেওয়া হতো লোহার পাত দিয়ে। এই রকম পট্টিকে বলা হতো জোঁকা বা আকুণ্ডি। পাথরের পাট পাড়ের মাটিকে আগরে যেতে বাধা দেয়। পাথর দিয়ে ঘেরা এই ক্ষেত্রকে বলে পঠিয়াল। পঠিয়ালে সুন্দর মন্দির, ছত্র ও ঘাট করার প্রচলন রয়েছে।

পুকুর বা ঘাটের আকার খুব বড় হলে ঘাটে পাথরের সিঁড়ি করা হয়। যদি পুকুর খুবই বড় ও গভীর হয় তাহলে সিঁড়ির দৈর্ঘ্য ও সংখ্যাও সেই অনুপাতে বাড়বে। এক্ষেত্রে পাড়ের মতো সিঁড়িও মজবুত করার জন্য হথনি করা হয়। হথনি হলো প্রতি আট বা দশ সিঁড়ি অন্তর একটা করে বারান্দার মতো চওড়া সিঁড়ি। তা না হলে জলের বেগ সিঁড়ি ফাটিয়ে দিতে পারে।

এই রকমই কোন হথনির দেওয়ালে তাক করে তাতে ঘাটৈয়াবাবার প্রতিষ্ঠা করা

হয়। ঘাটেয়াবাবা ঘাটের দেখাশোনা করেন। সাধারণ ভবে ঘাটেয়াবাবা প্রতিষ্ঠিত হন অপরার উচ্চতার হিসেবে। যদি বৃষ্টি বেশী হয়, আগৌর থেকে জল লাগাতার আগরে আসতে থাকে, পুকুরের বিপদ ঘনিয়ে আসে তাহলে ঘাটেয়াবাবার চরণ পর্যন্ত জল আসার পর অপরা বইতে শুরু করবে। জল আর বাড়বে না। এইভাবেই মানুষ ও দেবতা উভয়ে মিলে ঘাটের রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

পুকুরের মতো নদীতেও ঘাটেয়াবাবা স্থাপিত হয়েছেন। বুড়ো-বুড়ি, ঠাকুরদা-ঠাকুরমা যাঁরা নিজেরা ঘাটে যেতে পারেন না, (বন্যার সময়) তাঁরা ঘাট ফেরত নাতি -নাতনি, ছেলে-মেয়েদের খুব উৎসাহের সঙ্গে এই প্রশ্নটাই করেন, 'জল কতদূর বেড়েছে, ঘাটেয়াবাবার চরণ পর্যন্ত এসেছে?' জলে তাঁর পা ধোয়া গেলেই হলো। এতটা জল যদি আগরে জমা হয় তাহলেই সারা বছরের কাজ চলবে।

আগরের ভেতর আলাদা আলাদা জায়গায় স্থাপিত স্তম্ভ সারা বছর ধরে আগরের জলরাশিকে, কোষাগারকে পরিমাপের কাজ করে। নাগষষ্ঠী খুবই পুরোনো শব্দ।এটি কাজে লাগে সাধারণত নতুন খোঁড়া পুকুরের জলস্তর মাপার জন্য। এর ওপর সাধারণত সাপ প্রভৃতির মূর্তি খোদাই করা হয়। যেটাতে নাগের অলরক্ষণ থাকে না সেটাকে শুধু

কোহনী

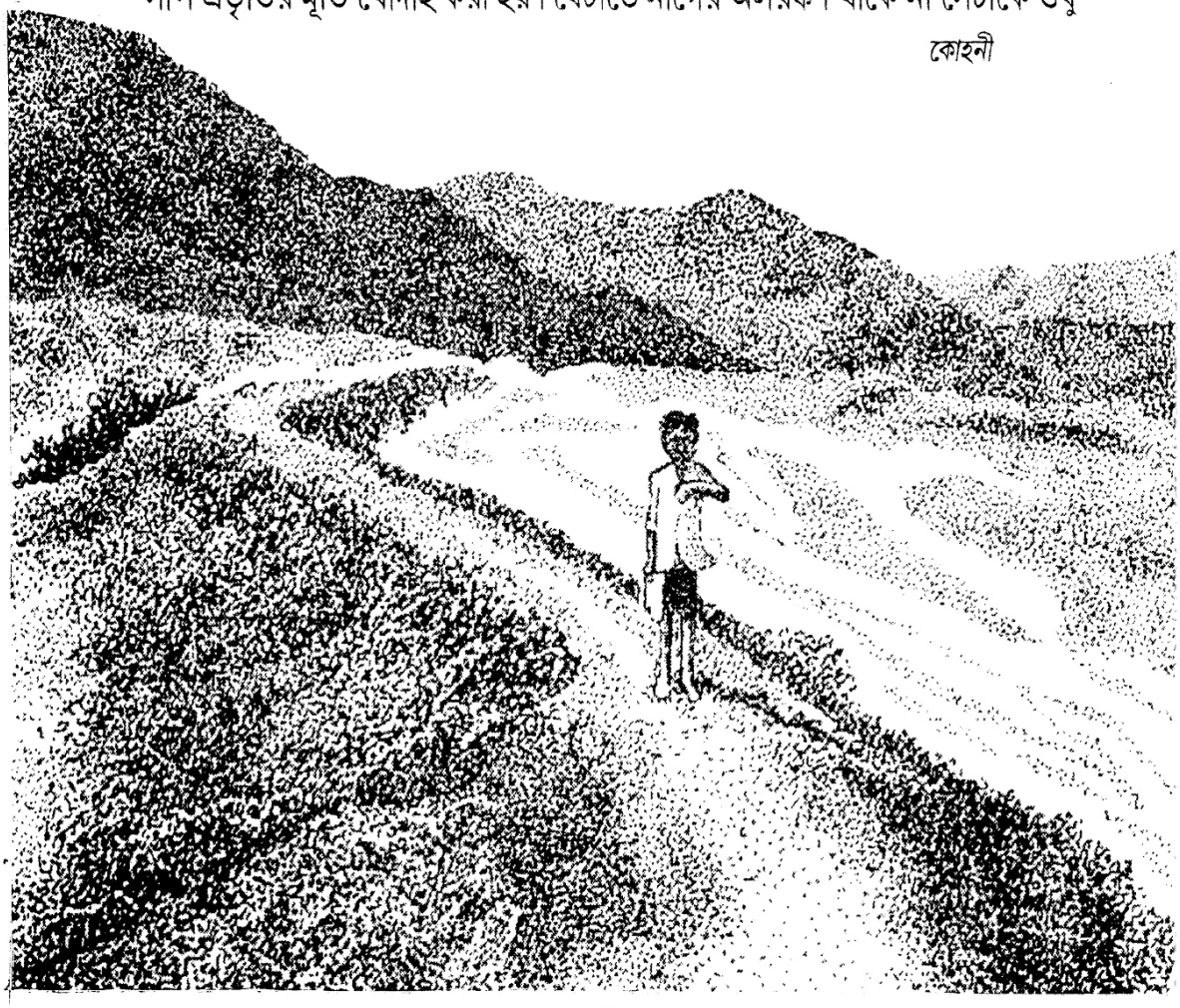

যষ্ঠীই বলা হয়। ধীরে ধীরে সরতে সরতে এই শব্দই হয়ে যায় 'লাঠ'। স্তম্ভ, জলস্তম্ভ বা শুধু থামও বলা হয়। কোথাও আবার পনসাঁল অথবা পৌসরাও বলা হয়েছে। এই স্তম্ভ শুধু পুকুরের অগোরেই নয়, বিভিন্ন অঙ্গে বসানো হয়ে থাকে। বসানোর সময়ও আলাদা এবং প্রয়োজনও বিভিন্ন প্রকারের।

স্তম্ভ - পুকুরের মাঝামাঝি, অপরাতে, মোখিতে অর্থাৎ যেখান থেকে সেচ হয় এবং আগৌরেও বসানো হয়। স্তম্ভ, জল পরিমাপের কাজে লাগে ঠিকই তবে এতে গজ ফুট প্রভৃতি নীরস চিহ্নের বদলে পদ্ম, শঙ্খ, নাগ, চক্র-র মতো চিহ্ন জলের এক নিশ্চিত গভীরতার ইঙ্গিত দেয়। সেচের জন্য যে পুকুর, তার স্তম্ভের এক বিশেষ চিহ্ন পর্যন্ত জল নেমে গেলে জলের ব্যবহার তখনি বন্ধ করে দেওয়া হবে; বাকি জলটুকু অসময়ের জন্য সুরক্ষিত করে রাখা হবে। পাড়েও স্তম্ভ লাগানো হয় কিন্তু পাড়ের স্তম্ভ ডোবার অর্থ প্রলয় আসছে।

নাগযষ্ঠি

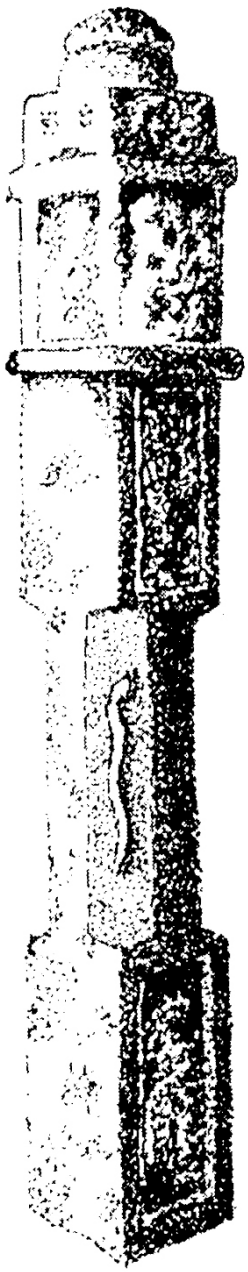

স্তম্ভ পাথরের হত আবার কাঠেরও। কাঠের জাত এমন ভাবে বাছা হতো যাতে জলে নষ্ট না হয়ে যায়। এই রকম কাঠের এক পুরোনো নাম ক্ষত্রীয় কাষ্ঠ। স্তম্ভের জন্য সবসময় জাম, শাল, তাল প্রভৃতি কাঠের ব্যবহার হয়েছে। এগুলির মধ্যে শালের স্থায়িত্বের জন্য এমন কিছু প্রবাদ চালু ছিলো যা আজও হারিয়ে যায়নি। শাল সম্পর্কে হলা হয় - 'হাজার সাল খাড়া, হাজার সাল পড়া, হাজার সাল সড়া।' ছত্রিশগড়ের অনেক পুকুরে আজও শালের স্তম্ভ পাওয়া যায়। রায়গড়ের পুরাতত্ত্ব সংগ্রহশালায় শাল গাছের হাজার বছরের পুরোনো একটা টুকরো সত্যি সত্যিই, যেন প্রবাদের জগৎ থেকে বের করে এনে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এটা একাটি জলস্তম্ভের অংশ যা ঐ এলাকারই চন্দ্রপুর, অধুনা বিলাসপুর জেলার, কিরানি গ্রামে হীরাবাঁধ নামক পুকুর থেকে পাওয়া গেছে। হীরাবাঁধ দ্বিতীয় শতাব্দীরও আগের সাতবাহন রাজার সময়ের তৈরী স্তম্ভটির ওপর রাজ্যের শাসনকর্তাদের নাম খোদাই করা আছে। সম্ভবত যাঁরা ঐ পুকুর ভর্তি উৎসবের সময় উপস্থিত ছিলেন নামগুলি তাঁদেরই।

পরিস্থিতি না বদলালে কাঠ খারাপ হয় না। স্তম্ভ সবসময় জলেই ডুবে থাকতো। তাই বছরের পর বছর কেটে গেলেও

খারাপ হতো না।

কোথাও কোথাও পাড় বা ঘাটের পুরো দেওয়ালে ভিন্ন উচ্চতায় ভিন্ন ধরনের মূর্তি খোদাই করা হতো। এগুলির আকার দেওয়া হতো প্রায়ই মাথার মতো। সবার নীচে ঘোড়া ও সবার ওপরে হাতি। পুকুরের বেড়ে ওঠা জল পর্যায়ক্রমে এই মূর্তিগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে উঠতো আর সকলেই জানতে পারতেন জল কতটা ভরেছে। এইরকম স্থাপত্যের অমর উদাহরণ জয়সলমেরের অমর সাগরের দেওয়ালে খোদিত ঘোড়া, হাতি ও সিংহের মূর্তিগুলি।

স্তম্ভ ও নেষ্টা একটিকে অন্যটির সঙ্গে জুড়ে দেওয়াতে দেখতে লাগে চমৎকার। আলওয়ার থেকে প্রায় একশো কিলোমিটার দূরে আরাবল্লী পাহাড়ের ওপর জনবসতি থেকে অনেক দূরে একটি পুকুর রয়েছে - শ্যামসাগর। এটা সম্ভবত পনেরশো শতাব্দীতে যুদ্ধের সময় সৈনিকদের প্রয়োজনে তৈরী হয়েছিলো। এর পাড়ে বরুণ দেবতার একটা স্তম্ভ আছে। স্তম্ভের উচ্চতার হিসেবে তার থেকে এক ফালং দূরত্বে শ্যামসাগরের অপরা। আগরে বেড়ে ওঠা জল বরুণ দেবতার পা ছোঁয়ামাত্র অপরা বইতে শুরু করে। পুকুরে এর থেকে বেশী জল ভরে না। বরুণ দেবতা কখনও ডোবেন না।

জলস্তম্ভ দিয়ে থাকে জলস্তরের খবর
আর পুকুরের গভীরতা মাপা হতো সাধারণত পুরুষ মাপ দিয়ে।
দুই হাত দুই দিকে মেলে থাকা পুরুষের
এক হাত থেকে অন্য হাত পর্যন্ত পুরো দৈর্ঘ্যকে
বলা হয় পুরুষ বা পুরুখ।

জলস্তম্ভ দিয়ে থাকে জলস্তরের খবর। আর পুকুরের গভীরতা মাপা হতো সাধারণত পুরুষ মাপ দিয়ে। দুই হাত দুই দিকে মেলে থাকা পুরুষের এক হাত থেকে অন্য হাত পর্যন্ত পুরো দৈর্ঘ্যকে বলা হয় পুরুষ বা পুরুখ। ইঞ্চি ফুটের মাপে এই মাপ হয় ছয় ফুট। এই রকম কুড়ি পুরুখ গভীরতার পুকুরকে মনে করা হতো আদর্শ পুকুর। পুকুর যারা তৈরী করতেন তাঁদের ইচ্ছে থাকতো এই বিশিকে ছোঁয়ার। কিন্তু তাদের সামর্থ ও আগর-আগৌরের ক্ষমতা অনুসারে এই গভীরতা কম বেশী হতো।

সাধারণত বিশি বা তার থেকেও গভীর পুকুরগুলিতে তরঙ্গের বেগ ভাঁঙ্গার জন্য আগরের মাঝে টাপু (দ্বীপ) করা হতো। তাছাড়াও এই ধরনের গভীর পুকুর খোঁড়ার

সময় প্রচুর মাটি উঠতো। পাড়ের প্রয়োজন মিটিয়েও মাটি বেঁচে যেতো। কিন্তু এত মাটি বাইরে দূরে কোথাও বয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলাও কঠিন তাই টেকনিক্যালি ও ব্যবহারিক উভয় কারণেই পুকুরের মাঝে দ্বীপের মতো এক বা একাধিক স্থান ছেড়ে দেওয়া হতো। প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাটি এর ওপর ঢালা চলতো। এসব সুবিধার কথা বাদ দিলেও কানায় কানায় ভরে ওঠা পুকুরের মাঝে উচুঁ হয়ে থাকা এই দ্বীপ দৃশ্যতঃ মনোরম।

টাপু, টিপুয়া, টেকরি ও দ্বীপ-এর মতো শব্দ তো এই অঙ্গটির জন্য পাওয়া যায়ই কিন্তু রাজস্থানে এই বিশেষ অঙ্গটিকে একটি বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছে - লাখেটা।

লাখেটা ঢেউয়ের গতিকে বাধা দেয়। এছাড়াও সে পুকুর ও সমাজকে যুক্ত করে। যেখানেই লাখেটা পাওয়া যায়, দেখা যায় তার ওপর সেই এলাকার কোনো সিদ্ধপুরুষ, সতী বা স্মরণযোগ্য ব্যক্তির, স্মৃতির উদ্দ্যেশ্যে সুন্দর ছত্র রয়েছে। লাখেটা বড় হলে ছত্রের সঙ্গে খেজুরি ও অশ্বত্থ গাছও পাওয়া যায়।

সব থেকে বড় লাখেটা। আজ এই লাখেটার ওপর রেলস্টেশন, বাসস্ট্যান্ড — পরিকল্পিত এক শিল্পনগরী গড়ে উঠেছে। যেখানে হিন্দুস্থান ইলেকট্রো গ্রাফাইটের মতো কারখানা গড়ে উঠেছে। মধ্য রেলওয়ে দিয়ে ভূপাল হয়ে ইটারসি যাওয়ার পথে মন্ডিদ্বীপ নামক স্থানে এক সময় ভূপাল পুকুরের লাখেটা ছিলো। কোন এক সময় প্রায় দুশো বর্গমাইল জুড়ে ছড়িয়ে থাকা এই পুকুর, হুসেনশাহের আমলে ভেঙ্গে দেওয়া হয়। আজ সে পুকুর শুকিয়ে যাওয়াতেই মন্ডিদ্বীপ, দ্বীপ না থেকে এক শিল্পনগরী হয়ে উঠেছে।

'প্রণালী' ও 'সারণী' পুকুরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকা দুটি শব্দ। শব্দ দুটি নিজেদের অর্থের বিস্তার ঘটিয়েছে ক্রমাগত। একসময় শব্দগুলি পুকুর প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত সেচের জন্য তৈরী নালার নাম ছিলো। আর এখনতো শাসনের জন্যও প্রণালী রয়েছে এবং সময় 'সারণী'-র কথাও আমরা জানি।

সেচের প্রথম নালা যেখান থেকে বের হয় তা হলো মুখ, মোখা বা মোখী। মুখ্য নহর বা 'রজবহা'ও বলা হয়। খুবই বিশিষ্ট পুকুরের রজবহা মর্ত্যলোকের রাজ্য পেরিয়ে দেবলোককেও ছুঁয়ে ফেলতো তখন একে বলা হতো রামনাল। জয়সলমেরের ধূত মরুভূমি এলাকায় সাজানো-গোছানো সুন্দর বাগান -'বড়াবাগ'। বড়াবাগের সেচ, জৈতসর নামের এক বড় পুকুর থেকে বেরোনো রামনাল থেকেই হয়ে চলেছে। এখানকার আমবাগান সহ অন্যান্য বাগান এত ঘন সবুজ যে মরুভূমিতে আগুন

বর্ষণকারী সূর্য যদি বড়াবাগে এসেও থাকে, তো তবে তা সবুজ রঙে ডুবে শীতল হওয়ার জন্যই।

রজবহা থেকে বেরিয়ে আসা অন্য নহরগুলিকে বহতল, বহিয়া, বহা এবং বাহ-ও বলা হয়। জল বয়ে চলা রাস্তার ওপর যে বসতি গড়ে উঠেছে তারও নামকরণ করা হয়েছে, এরই অনুষঙ্গে। কোনো অংশ থেকে এপার ওপার বার করা নালির মুখ পুকুরের দিকে ডাট লাগিয়ে বন্ধ করে রাখা হয়। যখন জল বার করার প্রয়োজন তখন ডাট খুলে দেওয়া হয়। তাহলে তো কাউকে জলে ঝাঁপ দিতে হবে। কেননা ঐ তলায় গিয়ে ডাট খুলতে হবে এবং একইভাবে বন্ধ করতে হবে। এই কাজকেই সহজ করে দেয় ডাট নামক অঙ্গ। ডাট পাড়ের থেকে পুকুরের ভিতর দিকে, ছোট কিন্তু গভীর চৌবাচ্চার ঢঙ্গে তৈরী। এই বর্গাকার চৌবাচ্চা সাধারণত দুই থেকে তিন হাতের হয়। জলের দিকের দরজাতে উচ্চতা অনুসারে আলাদা আলাদা দু-তিনটে ফুটো থাকে। ফুটোর আকার হয় এক বিঘৎ বা ততটাই যতটা একটা বড় লাঠি দিয়ে বন্ধ করা যায়। সামনের দেওয়ালেও এই ধরণের ফুটো থাকে কিন্তু শুধু মাত্র নীচের দিকে। এই ফুটো পার করে পাড়ের অপর দিকের নালি দিয়ে জল বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। চৌবাচ্চার উচ্চতা হয় আট থেকে বারো হাত এবং নীচে নামার জন্য দেওয়ালে এক হাত পর পর, ছোট ছোট পাথর গাঁথা থাকে। এই ব্যবস্থার জন্য ডাট খুলতে জলে নামতে হয় না। পাথর দিয়ে শুকনো চৌবাচ্চায় নেমে যে ফুটোটা খুলতে হবে তার ডাট সরিয়ে জল ছেড়ে দিলেই হলো। পাড়ের দিকের নালি বেয়ে জল বাইরে আসে। এই ডাটের মতই স্থাপত্য রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু এবং গোয়াতে পর্যন্ত পাওয়া যায়। নাম অবশ্যই পাল্টে যায়। যেমন - চুকরৈণ্ড, চুরণ্ডি, চৌণ্ডা ও উরৈণ্ড। প্রত্যেকটিই জল বাইরে আসার প্রক্রিয়া, তাই প্রতিটি নামেই 'উণ্ডেলনে' (তরল পদার্থ ঢালা) শব্দটির আংশিক উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়।

পুকুর থেকে নহর বা নালায় যে জল ছাড়া হয়, তা গড়ান দিয়ে দূরে দূরে বয়ে যায়। কিন্তু কিছু বড় পুকুরে যেখানে মোখির পাশে জলের চাপ খুব বেশি সেখানে এই চাপকে, নহরের ওপরে জল তোলার কাজে ব্যবহার করা হয়। মোখি থেকে বেরিয়ে আসা জল কয়েক হাত ওপরে উঠে আবার নহরের ঢালুতে অনেক দূর পর্যন্ত শুধু বয়ে যায় তাই নয়, কিছুটা ওপরের জমিতেও গিয়ে পৌঁছায়।

প্রধান নহরের দুইদিকে কিছু দূরে দূরে কুয়োও করা হয়। এতে কপিকল লাগিয়ে জল তোলা হয়। পুকুর, নহর এবং কুয়ো ও কপিকল এই চারের সুন্দর মিলন একের পর এক ক্ষেতকে সেচের সঙ্গে যুক্ত করে নিতো। এই ব্যবস্থা বুন্দেলখণ্ডে চন্দেলো-

বুন্দেলোর সময় তৈরী এক-এক হাজার একরের বরুয়া সাগর, অরজর সাগর-এ আজও কাজ করছে। ওরছার রাজা উদিত সিংহ, বরুয়া সাগর তৈরী করিয়েছিলেন ১৭৩৭সালে এবং ১৬৭১ সালে সুরজন সিংহ, অরজর সাগর তৈরী করান। এই নহর গুলি আজ উত্তরপ্রদেশের সেচ দপ্তরের সুনাম বৃদ্ধি করছে।

সমস্ত ব্যবস্থার পরও যদি জল চুরি বন্ধ না করা যায়, তাহলে দেখতে দেখতেই ভালো, ভালো বড় পুকুরও শুকিয়ে যাবে। বর্ষায় কানায় কানায় পূর্ণ, শরৎ-এর ঝকঝকে নীল রঙে ডুব দেওয়া, শিশিরে শীতল হওয়া, বসন্তে নেচে ওঠা কিন্তু তারপর গরমে? জলন্ত সূর্য পুকুরের সব জল টেনে নেবে। সম্ভবত এই পুকুর প্রসঙ্গেই সূর্যের আর এক নাম রাখা হয়েছিলো 'জলচোর' (অম্বুতস্কর)। সূর্যের মতো চোর এবং আগর অর্থাৎ কোষাগার বিনা পাহারায় পড়ে থাকলে চুরি হতে আর কত দেরী!

এই চুরি ঠেকানোর ব্যবস্থা করা হয় আগর ঢালদার করে। জল যখন কমে আসে তখন এই কম পরিমাণ জল বেশী জায়গায় ছড়িয়ে থাকলে তা তাড়াতাড়ি বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে। তাই আগর ঢালু হলে জল কম জায়গায় জমে থাকবে। ফলে জল তাড়াতাড়ি বাষ্প হয়ে যেতে পারবে না। ঢালু স্তরে কিছুটা গভীরতাও রাখা হয়। এই রকম গভীর গর্তকে আখড়া বা পিয়াল বলে। বুন্দেলখণ্ডে একে বলে ভর। কোথাও কোথাও এটি বাণ্ডারৌ বা গর্ল নামেও পরিচিতি রয়েছে। পুকুরের এই অঙ্গের স্থান রাখা হয় প্রধান ঘাটের দিকে অথবা মাঝখানে। মাঝখানে গর্ত থাকলে গরমের দিনে পুকুর চারদিক থেকে শুকিয়ে আসবে। এই অবস্থায় জল ঘাট থেকে সরে আসবে, এটা দেখতেও ভালো লাগে না, ব্যবহারেও অসুবিধা তাই প্রধানত মুখ্য ঘাটের দিকেই ঢাল রাখার প্রচলন বেশী। তখনও তিন দিক থেকে কিছুটা জল চুরি হতেই থাকে কিন্তু মুখ্য বাহুতে জল থাকে সব সময়ই।

মোখী

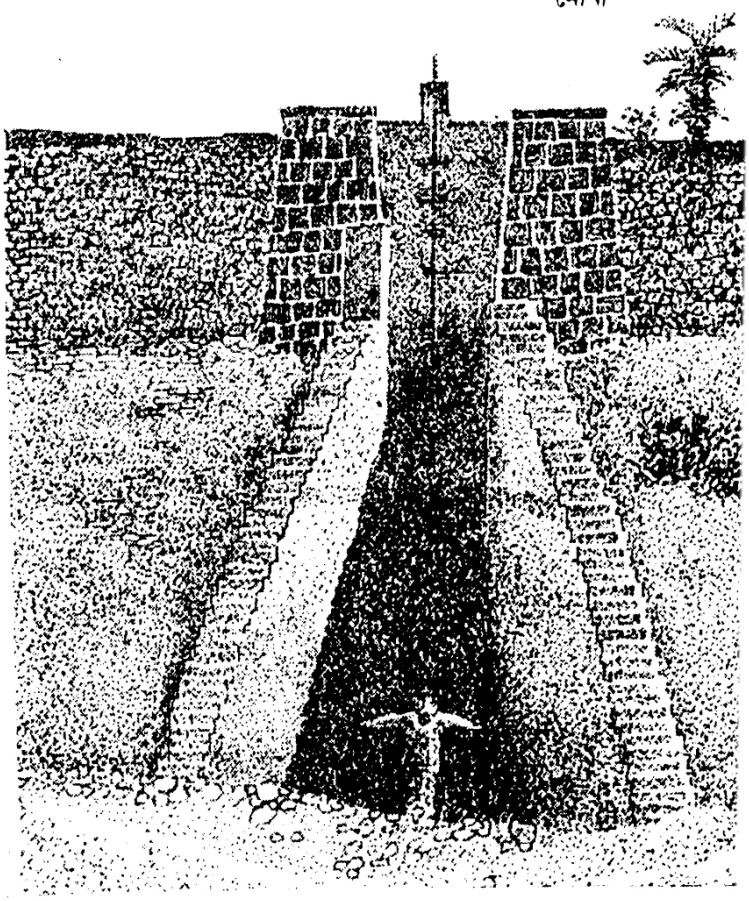

**বাংলার পূণ্যি পুকুর*

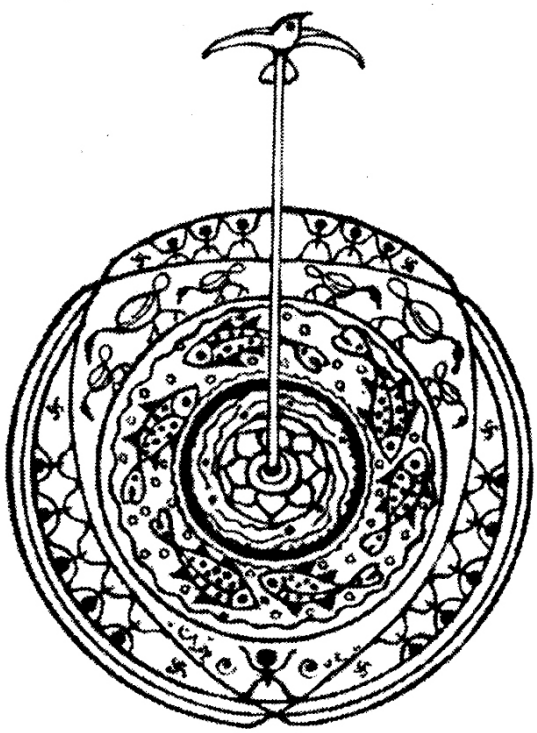

গ্রীষ্ম শেষ হতে না হতেই মেঘ জমতে শুরু করে, আগৌর থেকে আগর ভরে, সাগরে ঢেউ ওঠে।

সূর্য জল চুরি করে আবার সূর্যই জল ফিরিয়ে দেয়।

১। এই প্রসঙ্গে মানভূম ও সিংভূম অঞ্চলে একটি লোক কথা প্রচলিত রয়েছে। কারও বাড়িতে কোন উৎসব ভোজ-কাজ থাকলে সেই পরিবার আগের দিন গিয়ে পুকুরে মানত করে আসতো। পরের দিন পুকুরে গিয়ে দেখা যেতো থালা বাসন উঠেছে। প্রয়োজন মতো ব্যবহারের পর সেগুলো পুকুর ঘাটে রেখে আসতে হতো। পুকুর আবার তা ফিরিয়ে নিতো। অবশ্য সব পুকুর প্রসঙ্গেই নয়, কিছু পুকুর প্রসঙ্গে এই কথা প্রচলিত রয়েছে। (সিংভূমের কথাটি শুনিয়েছেন সুবোধ বসু রায় এবং মানভূমের কথাটি শুনিয়েছেন সুনীল মাহাতো)

* খাল, বিল, দীঘি, সায়র, পুকুরে ভরভরন্ত বাংলায় পুকুরের সস্কৃতিটিও ছিল যথেষ্ঠ উন্নত। এখন আর বাংলার মেয়েদের পূন্যি পুকুর ব্রত করতে দেখা যায় না। এক সময় বাংলার প্রতিটি ঘরে জৈষ্ঠ্যের দুপুরে বাড়ির উঠোনে প্রতীকী পুকুর কেটে মেয়েরা পুন্যি পুকুর ব্রত পালন করত। নিদাঘ দুপুরে দূর থেকে শোনা যেতো-পূন্যি পুকুর পুষ্প মালা...

সাফ মাথার সমাজ

পুকুরে জল আসে, জল যায়। এই আসা-যাওয়া পুরো পুকুরে প্রভাব ফেলে। বর্ষার খরধারা আগৌরের মাটি ধুয়ে নিয়ে আসে, আগরে মাটি ঘুলে ওঠে। পাড়ের মাটি ধ্বসে, আগরে মাটি জমে।

পুকুরের স্বরূপ নষ্ট হওয়ার এই খেলা চলে নিয়মিত। তাই পুকুর যাঁরা তৈরী করেন সেই মানুষজন, সেই সমাজ পুকুরের স্বরূপ রক্ষা করার খেলাটাও খেলে এসেছেন ততটাই নিয়ম পূর্বক। বিগত কয়েকশো বছর এই নিয়ম মাফিক পরিচর্যাই সমাজকে বাঁচিয়ে রেখেছিলো ঠিকমতো।

প্রথমবার পুকুরে জল ভরলেই পুকুরের রক্ষণাবেক্ষণের তোড়জোড় শুরু হয়ে যেতো। কাজটা কিন্তু তত সহজ ছিলো না। তবুও সমাজের সার্থেই দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত হাজার হাজার পুকুর বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন ছিলো। এই কঠিন কাজটি তাঁরা এত ব্যবস্থাসম্মত করে নিয়েছিলেন যে সব কিছু সহজ ভাবে হয়ে যেতো।

আগৌরে পা দিলেই রক্ষণাবেক্ষণের প্রথম কাজ দেখতে পাওয়া যাবে। পুকুরের আগৌর তৈরী আরম্ভ হতেই দেখতে পাওয়া যায় যে তার সূচনা দেওয়ার জন্য পাথরের সুন্দর স্তম্ভ স্থাপিত হয়েছে। দেশের অনেক এলাকাতেই এটা দেখতে পাওয়া যায়। স্তম্ভ দেখেই আপনি বুঝতে পারবেন এখন আপনি পুকুরের আগৌরে দাঁড়িয়ে। এখান থেকেই জল গিয়ে পুকুর ভরাবে। তাই আগৌরকে রাখতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জুতো প্রভৃতি পরে আগৌরে যাওয়া যাবে না। মল, মূত্র ত্যাগ বা থুতু ফেলার তো প্রশ্নই ওঠে না। 'থুতু ফেলবেন না, জুতো পরে আসবেন না' - এই রকম কোনো বোর্ড অবশ্য লাগানো হতো না। তবে মানুষজন স্তম্ভ দেখেই এই বিষয়গুলির পূর্ণ খেয়াল রাখতেন।

আগৌরের জলের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও শুদ্ধতা বজায় রাখার কাজ শুরু হতো

প্রথম দিন থেকেই। নতুন পুকুর যেদিন ভরে উঠতো সেদিনই মহাসমারোহে তাতে জীবজন্তু এনে ছাড়া হতো। মাছ, কচ্ছপ, কাঁকড়া ...। পুকুর বড় ও গভীর হলে তাতে কুমীরও[১]। কোন কোন জায়গায় সামর্থ অনুযায়ী জীবন্ত প্রাণীগুলির সঙ্গে সোনা রুপোর জীবজন্তুও বিসর্জন দেওয়া হতো। মধ্যপ্রদেশের রায়পুর শহরে সোনার নথ পরিয়ে কচ্ছপ ছাড়া হয় এই মাত্র বছর পঞ্চাশেক আগেও!

প্রথম বছর জলে কিছু বিশেষ প্রজাতির উদ্ভিদও দেওয়া হতো। ভিন্ন জায়গায় এর প্রকারভেদ ছিলো কিন্তু কাজ একই - জল পরিষ্কার রাখা[২]। মধ্যপ্রদেশে এই গাছগুলি ছিলো গদিয়া বা চিলা। অন্যদিকে রাজস্থানে প্রচলিত ছিলো কুমুদিনী, নির্মলী বা চাকসু। চাক্ষুষ থেকেই সম্ভবত চাকসু শব্দ এসেছে। কোন এক সময় পুকুরের জল পরিষ্কার রাখতে চাকসু চারার প্রচলন খুব বেশী পাওয়া যায়। বর্তমান জয়পুরের পাশে একটি বড় শহরের নাম চাকসু। সম্ভবত চাকসু চারার প্রতি কৃতজ্ঞতা বশতই এই নামকরণ।

পাড়ে অশ্বত্থ, বট[৩] প্রভৃতি গাছ লাগানোর চল অনেক দিনের। পুকুর ও এই গাছেদের মধ্যে যেন এক প্রতিযোগিতা দেখা যায় বয়স নিয়ে। কে বেশী দিন টেঁকে গাছ না পুকুর? প্রশ্ন সাধারণত উত্তরহীনই থেকে গেছে। উভয়ের এই দীর্ঘ সম্পর্ক এমনই অবিচ্ছেদ্য যে যদি একটি বিনষ্ট হয় তাহলে অন্যটিও যেন সেই মৃত সঙ্গীর শোকেই তাকে অনুগমন করে। গাছ কাটা পড়লে কিছুদিনের মধ্যেই পুকুরও শুকিয়ে ভরে ওঠে আর পুকুর নষ্ট হলে গাছও বেশীদিন বাঁচতে পারে না।

পুকুরে আম গাছও লাগানো হয়। তবে আমগাছ পাড়ে কম, পাড়ের নীচের জমিতেই বেশী দেখতে পাওয়া যায়। ছত্রিশগড়ের অনেক পুকুরেই মা শীতলা বসবাস করছেন মনে করে পুকুরগুলির পাড়ে নিমের গাছ অবশ্যই লাগানো হতো। গাছ ছাড়া, নেড়া পুকুরপাড়ের তুলনা করা হয়েছে মূর্তিহীন মন্দিরের সঙ্গে।

বিহার, উত্তরপ্রদেশের অনেক জায়গায় পাড়ের ওপর অরহড়-এর গাছও লাগানো হতো। এই এলাকায় নতুন তৈরী পুকুরের পাড়ে কিছুদিন পর্যন্ত সরষের খোলের ধোঁয়া করা হতো, যাতে ইদুঁরে বা অন্য কিছুতে গর্ত করে পাড়কে দুর্বল করে না দেয়।

এই কাজগুলো এমনই যে পুকুর তৈরীর পর একবার করলেই হয় বা খুব দরকার পড়লে আরও এক-আধ বার। কিন্তু পুকুরে মাটি জমা হয় প্রতি বছরই। তাই মাটি তোলার কাজটি সুন্দর নিয়মের বাঁধনে বাঁধা হয়েছিলো। কোথাও পাঁক তোলার মতো কঠিন পরিশ্রমের কাজকেও এক আনন্দঘন সামাজিক উৎসবে পরিণত করা হয়েছিলো। আবার কোথাও বা যেমন তা নীরবে পুকুরের তলায় গিয়ে জমা হতো ঠিক সেই ভাবেই নীরবে তুলে এনে পুকুরের পাড়ের ওপর রাখা হতো।

পাঁক ওঠানোর সময় স্থির করা হতো ঋতু দেখে। যে সময় পুকুরের জল সব থেকে কম থাকবে। গোয়া ও পশ্চিমঘাটের প্রান্তবর্তী অঞ্চলে এই কাজ দেওয়ালীর ঠিক পরই করা হয়। উত্তরের অনেক বড় এলাকায় এই কাজ করা হয় নববর্ষ অর্থাৎ চৈত্রের ঠিক আগে এবং ছত্রিশগড়, বাংলা, বিহার, ওড়িষা ও দক্ষিণে করা হয় বর্ষা আসার আগে, ক্ষেত প্রস্তুত করার সময়।

আজ পুকুর থেকে বিচ্ছিন্ন সমাজ আর সমাজ পরিচালনা করে যে প্রশাসন - উভয়েই পুকুর পরিষ্কার ও পাঁক তোলার কাজকে সমস্যার চোখে দেখে এবং এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা না করে নানান বাহানা খুজে বেড়ায়। তাদের আধুনিক হিসেবে এই কাজ খরচসাপেক্ষ। অনেক জেলাশাসক নিজের এলাকাতে পুকুর থেকে পাঁক তুলতে না পারার বড় কারণ হিসেবে এই কথাটাই বলেন যে 'এর খরচ এতো বেশী যে তার থেকে নতুন পুকুর খোঁড়ানোও সস্তা।' পুরনো পুকুর পরিষ্কার করানো হলো না, নতুন তো খোঁড়ার কথাই নেই। পাঁক পুকুরে নয়, পাঁক ভরে গেছে নব্য সমাজের মাথায়। তখন সমাজের মাথা অনেক বেশী সাফ ছিলো। তাঁরা পাঁককে সমস্যার মতো নয়, প্রসাদের মতো গ্রহণ করেছিলেন। প্রসাদ গ্রহণ করার পাত্র ছিলেন কৃষক, কুম্ভকার ও গৃহস্থ। এই প্রসাদ পেতেন যেসব চাষী তাঁরা প্রতি গাড়ি হিসেবে মাটি কাটতেন এবং নিজের জমিতে দিয়ে জমির উর্বরতা বাড়িয়ে নিতেন। এই প্রসাদের বদলে তিনি গাড়ি প্রতি কিছু নগদ বা ফসলের কিছু অংশ গ্রাম কোষে জমা করতেন। এই পয়সাতেই চলতো পুকুর মেরামতির কাজ। আজও ছত্রিশগড়ে লদ্দি (পাঁক) তোলার কাজ করেন কৃষক পরিবারগুলিই। এখন প্রত্যন্ত অঞ্চলে সাবান পৌঁছে যাবার পরও কিছু পরিবার লদ্দি দিয়েই সারে তাদের মাথা ঘসা বা স্নানের কাজ।

পুরোনো পুকুর পরিষ্কার করানো হলো না, নতুন তো খোঁড়ার কথাই নেই। পাঁক পুকুরে নয়, পাঁক ভরে গেছে নব্য সমাজের মাথায়। তখন সমাজের মাথা অনেক বেশী সাফ ছিলো। তাঁরা পাঁককে সমস্যার মতো নয়, প্রসাদের মতো গ্রহন করতেন।

বিহারে একে বলা হয় উড়াহি। উড়াহি হলো সমাজসেবা, শ্রমদান। গ্রামের প্রতিটি ঘর থেকে কর্মক্ষম সদস্যরা পুকুরে জমা হয়। প্রতিটি পরিবার থেকেই করা হবে এই মাটি তোলার কাজ। কাজের সময় গুড়জল খাওয়ানো হবে। পঞ্চায়েত থেকে যোগাড় করা অর্থের এক ভাগ খরচা হতো উড়াহি সংযোজনে।

দক্ষিণে ছিলো ধর্মদা প্রথা (ধর্মের কাজ বা ভালো কাজের জন্য জমি দান করার

প্রথা)। এই প্রথায় গ্রামের ভূমির এক অংশ দান করার প্রচলন ছিলো। এর থেকে যা অর্থ আসতো তা খরচ করা হতো পাঁক তোলার কাজে। এই রকম ভূমিকে কোড়গে বলা হতো।

প্রশাসন ও সমাজ যদি কোন কাজে কোমর বেঁধে নামে তো কোন কাজেই দেরী হয় না। দক্ষিনে পুকুরের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে উভয়ের এই মিলন ছিলো বহুল প্রচলিত। এই কাজের জন্য রাজ-খাজনা থেকে তো অনুদান পাওয়া যেতোই তাছাড়াও

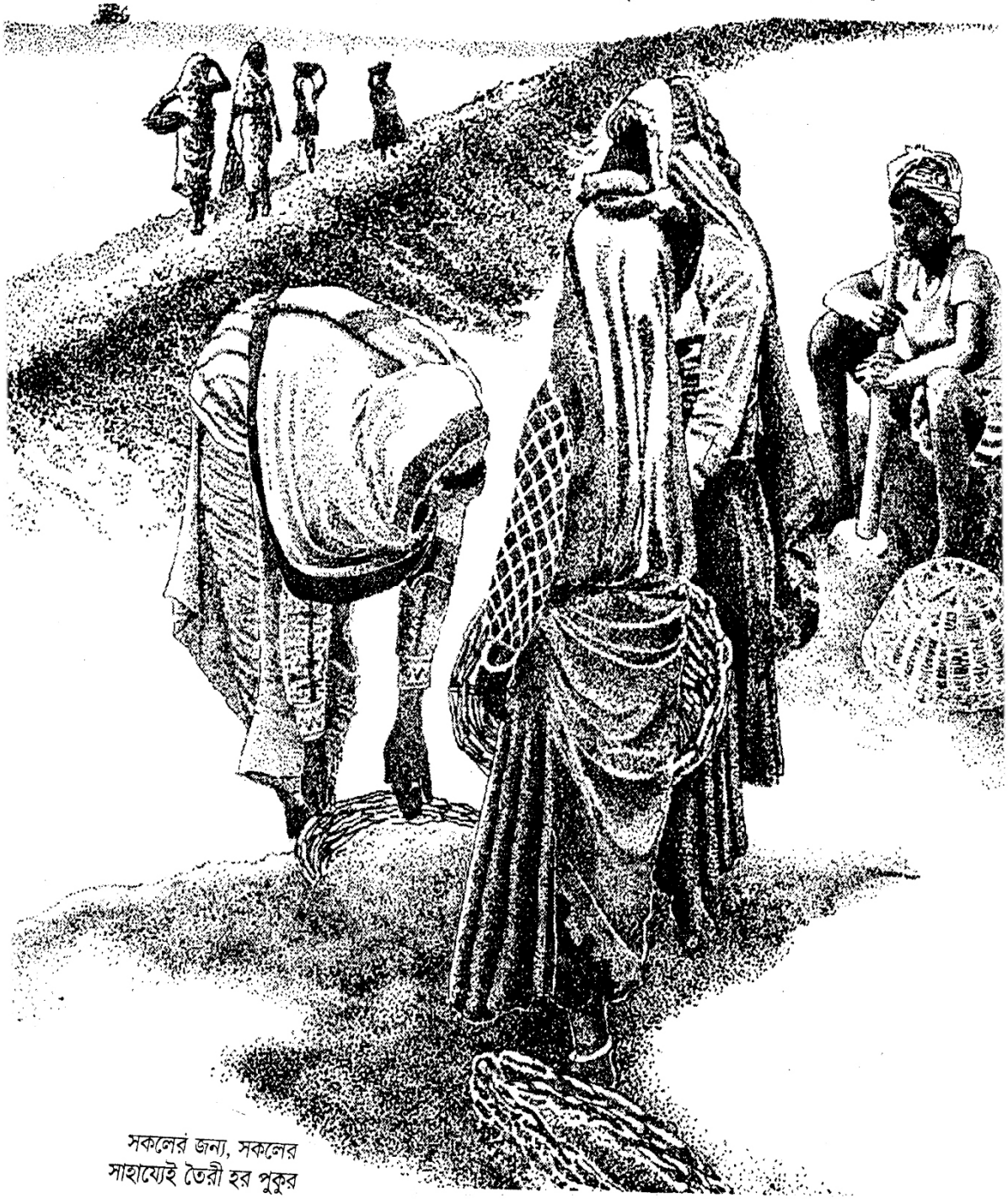

সকলের জন্য, সকলের সাহায্যেই তৈরী হর পুকুর

যাতে আলাদা একটা খাজনা সংগ্রহ ব্যবস্থা তৈরী করা যায় সেরকম একটি নিয়মও একই সঙ্গে লাগু ছিলো।

প্রতি গ্রামে কিছু ভূমি, ক্ষেত বা ক্ষেতের কিছু অংশ আলাদা করে রেখে দেওয়া হতো পুকুরের জন্য। এই জমির কর লাগতো না। এই জমিগুলিকে বলা হতো মান্যম্। মান্যমে্ যা আয় হতো বা যে ফসল পাওয়া যেতো তা খরচ করা হতো পুকুরের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন কাজে। যত প্রকারের কাজ তত প্রকারের মান্যম্। যেখানে যে কাজ করা দরকার সেখানেই তার ব্যবস্থা হতো, সেখানেই তার খরচ জোগাড় করা হতো।

শ্রমিকদের পারিশ্রমিক আসতো অলৌতি মান্যম্ থেকে। সারা বছর পুকুর দেখাশোনা করতেন যাঁরা তাঁদের জন্য ছিলো অনৌকরণ মান্যম্। পুকুর পাড়ে গরু, ছাগল, ভেড়া ... র যাতায়াত লক্ষ রাখতেন যে সমস্ত পরিবার তাঁদের জীবিকা নির্বাহ হতো এই মান্যম্ থেকে। পাড়ের মতো আগৌরেও পশুদের আটকে রাখার জন্য লোক লাগতো সারা বছর। এঁদের ব্যবস্থা হতো বঁন্দেলা মান্যম্ থেকে। পুকুরের সঙ্গে যুক্ত ক্ষেতগুলিতে ফসল বোনা থেকে কাটা পর্যন্ত পশুদের আটকানোর পারিশ্রমিক মেটাতো - বঁন্দেলা মান্যম্। এই কাজ যাঁরা করতেন তাঁদের বলা হতো পট্টি। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এই কাজ চলেছিলো।

সেচের সময় নহরের ডাট খোলা, খেতে সময়মতো জল পৌছানো, এগুলি আলাদা দায়িত্ব। এই পরিষেবা দিতো নীরমুনক্ক মান্যম। কোথাও কৃষক জল নষ্ট করছে কিনা, এটা যাঁরা দেখাশোনা করতেন তাঁদের বেতন দেওয়া আসতো কুলমকওল মান্যম্ থেকে। পুকুরে কত জল আছে, কোন কোন ক্ষেতে কী কী লাগানো আছে, কার কত জল প্রয়োজন, এ সমস্ত প্রশ্নের সমাধান করতো নীরঘন্টি বা নীরকুট্টি। দক্ষিণে এই পদ শুধুমাত্র হরিজন পরিবারগুলিকেই দেওয়া হতো। পুকুরের জলস্তর দেখে, ক্ষেতগুলিতে তা নায্যভাবে ভাগকরে দেওয়ার সূক্ষ্ম হিসেবের দক্ষতা দেখতে পাওয়া যায় এই নীরঘন্টিদের বংশধারায়। আজকের কিছু সমাজবিজ্ঞানী বলেন, 'হরিজনদের এই পদ দেওয়া হতো স্বার্থের জন্যই'। এই পরিবারগুলির নিজেদের জমি ছিলো না। তাই যাদের জমি ছিলো তাঁদের ক্ষেতে জলের যে কোন প্রকার বিবাদে এঁরা নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করতে পারতেন। কিন্তু যদি ভূমিহীন হওয়াই একমাত্র যোগ্যতার আধার হয়, তাহলে ভূমিহীন ব্রাহ্মণ তো সবসময়ই সুলভ। যাই হোক, আমরা আরও একবার মান্যম্-এ ফিরি।

অনেক পুকুরের জলই সেচ ছাড়াও খাওয়ার কাজেও ব্যবহৃত হতো। পুকুর থেকে যাঁরা ঘর পর্যন্ত জল পৌঁছাতেন তাঁদের বলা হতো কাহার। কাহারদের বেতন দেওয়া

হতো উরনি মান্যম্ থেকে।

পুকুরের সাধারণ ভাঙ্গা-চোরা ঠিক-ঠাক করা হতো উপ্পার ও ওয়াদি মান্যম্ থেকে। পুকুর ও পুকুরের নহরগুলির দেখা-শোনাতে খরচ হতো ওয়াক্কল মান্যম্-এর টাকা। পাড়ে ও নহরের ওপর গাছ লাগানো, সারা বছর তাদের লালন-পালন, পরিচর্যা, কাটছাঁট - এই সমস্ত দায়িত্ব পালন করতো মানল মান্যম্। খুলগা মান্যম্ ও পাটুল মান্যম্ সামলাত মেরামতি ছাড়াও নতুন পুকুর খোঁড়ার খরচও। এক পুকুরের সঙ্গে যুক্ত এত প্রকার কাজ, এত পরিষেবা সারা বছর ঠিক মতো চলছে কি না এটা দেখাও তো একটা কাজ! কোন কাজে কত লোক লাগাতে হবে, কোথায় কি মেরামত করতে হবে, এ সমস্ত ব্যবস্থাই করা হতো কটর মান্যম্ থেকে - একে কুলমবেট্টু বা কম্মোইবেট্টু-ও বলা হতো।

দক্ষিণের এই সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ বর্ণনা, পুকুর ও তার সঙ্গে যুক্ত সমগ্র ব্যবস্থার গভীরতাকে আমাদের সামনে সর্বৈবভাবে তুলে ধরতে পারে না। এ ব্যবস্থা তো অথৈ। এরকমই ব্যবস্থা বা এর সঙ্গে মিল রয়েছে এমন ব্যবস্থা উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম সবদিকেই সম্ভবত ছিলো। পরাধীনতার সময় তা কিছুটা নষ্ট হয়েছে এবং এরপর বিচিত্র স্বাধীন এই সমাজে সমস্ত কিছু ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল।

তবে গৈঙ্গজী কল্লার মতো মানুষ বারে বারেই এসেছেন এই ছিন্ন-ভিন্ন সমাজ ব্যবস্থাকে নিজেদের মতো করে শুধরে তোলার জন্য।

নাম তো ছিলো গঙ্গাজী, না জানি কীভাবে তিনি গৈঙ্গজী হয়ে গেলেন! স্নেহ, ভালবাসা বা আবদারের কারণেই সম্ভবত তাঁর নাম পাল্টে যায় বা বিকৃত হয়ে যায়। গৈঙ্গজীর শহরকে কয়েকশো বছর ধরে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিলো বিশাল বিশাল আটটা পুকুর। রক্ষণাবেক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার পর পুকুরগুলি ধীরে ধীরে উপেক্ষিত হতে থাকে, ধ্বসে পড়তে থাকে, নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। যদিও এগুলি তৈরী হয়েছিলো আলাদা আলাদা প্রজন্মেই, তবুও আটটির মধ্যে ছয়টি ছিলো একই শৃঙ্খলে বাঁধা। এগুলির রক্ষণাবেক্ষণও সেই প্রজন্মের মানুষ শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবেই করতেন বোধহয়। তারপর দেখাশোনার সেই সুবন্দোবস্ত, শৃঙ্খলা কোন এক সময় ভেঙ্গে পড়ে।

এই শৃঙ্খল ভেঙ্গে পড়ার শব্দ গৈঙ্গজীর কানে কখন পৌছায় জানি না, তবে আজ যেসব বুড়ো-বুড়ি ফলৌদি শহরে রয়েছেন তাঁরা গৈঙ্গজীর একটাই ছবি মনে রেখেছেন - ছেঁড়া চপ্পল পায় গৈঙ্গজী সকাল থেকে সন্ধ্যে ঘুরছেন এক পুকুর থেকে অন্য পুকুরে। স্নানের ঘাট, জল নেওয়ার ঘাট কেউ নোংরা করছে দেখলেই স্নেহভরা বকুনি দিতেন।

কখনো তিনি পাড়ের দেখাশোনা করছেন তো কখনো নেষ্টার। কোথাও কোন

পুকুরে কী ধরনের মেরামতি দরকার তার তালিকা তৈরী করে চলেছেন মনে মনে। পুকুরগুলিতে খেলতে আসতো যে সমস্ত বাচ্চারা তাদের বিভিন্ন ধরণের খেলা শেখাতেন, নিজেও তাদের সঙ্গে খেলতেন। শহরের তিনদিক ঘিরে থাকা এই পুকুরগুলিতে একপাক দিতে সময় লাগতো প্রায় তিন ঘন্টা। গৈঙ্গজীকে কখনো প্রথম পুকুরে দেখা যেতো তো কখনো শেষ পুকুরে। সকালে এখানে পাওয়া যেতো তো দুপুরে ওখানে, আর সন্ধ্যেবেলা না জানি কোথায়! গৈঙ্গজী নিজেই নিজের কাঁধে পুকুরগুলি রক্ষণাবেক্ষণের ভার তুলে নিয়েছিলেন।

বছরের শেষে একটা সময় দেখা যেতো গৈঙ্গজী পুকুরের বদলে শহরের গলিতে গলিতে ঘুরছেন। প্রতিটি ঘরের দরজায় পৌছাতেই তিনি এক টাকা পেয়ে যেতেন না চাইতেই। সকলেই জানতেন, গৈঙ্গজীর এক টাকাই প্রয়োজন; তার বেশীও নয়, কমও নয়। টাকা তোলা হয়ে গেলে সারা শহরের বাচ্চাদের জোটাতেন। বাচ্চাদের সঙ্গেই জমা হতো - ঝুড়ি, হাতঝড়া, টামনা, কোদাল। একের পর এক পুকুর পরিষ্কার হতো। প্রতিটি পুকুরের নেষ্টা পরিষ্কার হতো, আগরের মাটি তুলে দেওয়া হতো পাড়ে। প্রতি ঝড়া মাটির জন্য একজন বাচ্চা পেতো পুরস্কার দু-আনা পয়সা।

গৈঙ্গজী কল্লা কখন থেকে এই কাজ করছিলেন, তা এখন আর কারও খেয়াল নেই। শুধু এইটুকুই জানা যায় ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত চলেছিলো এই কাজ। এরপর গৈঙ্গজী চলে গেলেন।

কোনো মৃত্যুকে শহর এরকম ভাবে মনে রাখেনি। পুরো শহরটাই যোগ দিয়েছিলো তাঁর অন্তিম যাত্রায়। একটি পুকুরের নীচে ঘাট তৈরী করে তাঁর অন্তিম সৎকার করা হয় এবং সেখানেই সমাধি তৈরী করা হয়। যিনি পুকুর তৈরী করতেন সমাজ তাঁকে সন্ত্-এর সম্মান দিতো। গৈঙ্গজী নতুন পুকুর তো তৈরী করেন নি, আগের পুকুরগুলিই রক্ষণাবেক্ষণ করে গেছেন, তবুও সমাজ তাঁকে সন্ত্-এর সম্মানই দিয়েছে।

ফলৌদিতে এই খেলা সন্ত্ খেলেছেন, তো জয়সলমেরে রাজা নিজেই খেলেছেন এই খেলা। সারা শহর জানতো, তবুও ঢেড়রা পড়তো - 'রাজার পক্ষ থেকে, বছরের শেষদিন, ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর দিন শহরের সবথেকে বড় পুকুর ঘড়সীসরে লহ্াস খেলার আমন্ত্রণ রইল।' সেদিন রাজা, রাজপরিবার, দরবার, সেনা ও প্রজা সকলেই ঘড়সীসরে জমা হতেন কোদাল, টামনা, ঝড়া নিয়ে। রাজা মাটি তুলে প্রথম ঝড়া ভরে পাড়ে নিয়ে গিয়ে ফেলতেন, বাজ-বাজনা সহ লহ্াস শুরু হতো। দরবারের তরফ থেকে এদিন সমস্ত প্রজার পান-ভোজনের ব্যবস্থা থাকতো। রাজা প্রজা সকলেরই হাত মাটিতে একাকার। এ দিন রাজার কাঁধের সঙ্গে যে কারো কাঁধের ধাক্কা লাগতে পারতো। যিনি দরবারেও সুলভ নন্, আজ তিনিই পুকুরের

দরজায় মাটি বইছেন। রাজার অঙ্গরক্ষীরাও যোগ দিতেন এই কাজে।

এই রকমই এক লহ্াসে জয়সলমেরের রাজা তেজসিংহ-এর ওপর আক্রমণ হয়। তিনি পুকুরের পাড়েই মারা যান, লহ্াস খেলা কিন্তু বন্ধ হয়নি, চলতে থাকে, ছড়িয়ে পড়ে। মধ্যপ্রদেশের ভীল সমাজেও লহ্াস খেলা হতো। গুজরাতেও চালু আছে। গুজরাতে তো এই ঐতিহ্য পুকুর থেকে প্রসারিত হয়ে সামাজিক যেকোন কাজে যুক্ত হয়েছিলো, যাতে সকলের সাহায্য প্রয়োজন। 'সকলের জন্য সকলের সাহায্য' - এই বিশ্বাস বা প্রথা থেকেই পুকুর তৈরী হতো। একই দৃষ্টিভঙ্গীতে তা রক্ষণাবেক্ষণও। পাঁক তোলা, ফেলা - সমাজের এই খেলা লহ্াস উল্লাসের সঙ্গে চলতো।

১। পুরুলিয়া জেলার কালুহারার বড় বাঁধে কুমীর দেখেছেন এমন অনেকেই এখনও বেঁচে আছেন। এই মাত্র বছর পঞ্চাশ ষাট আগের কথা। কাশীপুরের রাজা জ্যোতিপ্রকাশ। তাঁর একমাত্র শখ 'শিকার'। খবর পেলেন কালুহারার বড় বাঁধে কুমীর আছে। নতুন ধরনের শিকারে উৎসাহী রাজা এক রাত্রে বড় বাঁধের চারদিকে মশাল জ্বালিয়ে দিলেন, সঙ্গে চলল নাচনী নাচ। মগরা (সেচের জল বার করার রাস্তা) আগেই খুলে দেওয়া হয়েছিলো। জল প্রায় শেষ হয়ে এলে কুমীরগুলো পাঁকে লটপট করতে থাকে। রাজা বড় বাঁধের দ্বীপে চেয়ার নিয়ে বসে বন্দুক দিয়ে একের পর এক কুমীর মেরে চলেন। তারই মধ্যে একটা কুমীর কোনভাবে পালিয়ে যায় পাশের বাঁধে। একা পড়ে সেই কুমীরটা পরে পাগলের মতো আচরন করতে থাকে। তাই গ্রামের মানুষ ভয়ে আবার রাজাকে খবর দেয়। রাজা এসে সেটিকেও মেরে ফেলেন।

২। বাংলার পুকুরগুলিতে এই কাজ করতো দল ও কচুরিপানা নামক উদ্ভিদ।

৩। বাংলায় অর্জুন গাছের প্রচলন সব থেকে বেশী।

সহস্র নাম

উল্লাসের উচ্চতার যে দর্শন, তাকে গভীরতার সঙ্গে যুক্ত করেছেন যেসব মানুষ তাঁরা জীবনকে জলের একটা বুদবুদ মনে করেন। আর এই সংসারকে বিশাল এক সাগর। এখানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম আসে, চলে যায়; যুগ আসে, যুগ যায় - ঠিক ঢেউয়ের মতো। জীবন ও মৃত্যু তরঙ্গে তরাঙ্গায়িত ভবসাগরের দিকে এগিয়ে চলা সমাজ বিভিন্ন প্রকারে পুকুর তৈরী করেছেন এবং খুবই রুচিসম্মতভাবে সেগুলির নামকরণও করেছেন। এই নাম পুকুরের গুণাগুণ, স্বভাব বা বিশেষ কোন ঘটনা থেকেও রাখা হতো। নাম এত প্রকার যে কখনো কখনো তো ভাষা অভিধান কম পড়েছে। তখন চলিত কথা থেকে ধার নেওয়া হয়েছে; কখনো বা আবার সংস্কৃত পর্যন্ত পৌছাতে হয়েছে। সাগর, সরোবর ও সর চারদিকেই পাওয়া যাবে। সাগর ভালোবাসার খাতিরে সগরাও হয়েছে কোথায় কোথাও এবং সাঁধারণভাবে বড় পুকুরের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। সরোবর কোথাও সরবরও। সর সংস্কৃত সরস শব্দ থেকে এসেছে। গ্রামে এর সরসতা কয়েকশো বছর ধরে পাওয়া যাচ্ছে। আকারে বড় এবং ছোট পুকুরের নামকরণ জোহড়-জোহড়ি, বাঁধ-বাঁধিয়া, তাল-তলৈয়া তথা পুকর-পুকুরী প্রভৃতি পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের এই জোড়াগুলি দিয়ে হয়ে আসছে। এই জোড়গুলি রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও বাংলার বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যায়। এমন কি সীমা পেরিয়ে নেপালেও। পুকুর সংস্কৃত পুষ্কর থেকে এসেছে। অন্য জায়গায় তো গ্রামে গ্রামে পুকুর ছিলো, আর **বাংলায় ছিলো ঘরে ঘরে**। সাধারণত ঘরের পিছনে কম জায়গায় ছোট ছোট পুকুরে মাছ চাষ করা হতো। বাংলায় পুকুরের জন্য পুষ্করিনী শব্দও প্রচলিত রয়েছে। পুষ্কর তো ছিলোই। আদর বা শ্রদ্ধা পূর্বক পুকুরের পর 'জী' শব্দ বসে সাধারণ পুকুরকে সামান্য, অসাধারণ পুকুরে পরিণত করে। রাজস্থানে আজমের-এর কাছে পুষ্করজী নামে প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র আছে। এখানে ব্রহ্মার মন্দিরও রয়েছে।

যদিও সবথেকে বেশি প্রচলিত নাম পুকুরই কিন্তু পুকুরের নামকরণে এই শব্দের

প্রয়োগ কমই পাওয়া যায়। ডিগ্গি নাম হরিয়ানা, পাঞ্জাব, ও দিল্লীতেও পাওয়া যাবে। জল রাখার ছোট্ট চৌবাচ্চা (হৌজ) থেকে শুরু করে বড় পুকুর পর্যন্ত ডিগ্গি নামে পাওয়া যায়। অতীতের দিল্লীতে লালকেল্লার ঠিক সামনে লালডিগ্গি নামে একটি বড় পুকুর ছিলো। অম্বালাতে এখনও অনেক পুকুর রয়েছে যেগুলিকে ডিগ্গিই বলা হয়। ডিগ্গি শব্দ দীঘি, দীঘিকা প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ থেকে এসেছে।

হৌজ-এর মতই পাকা, ছোট্ট প্রকার হলো কুণ্ড। তবে কোথাও কোথাও বড়সড় পুকুরের নামও পাওয়া যায় হৌজ বা কুণ্ড। মধ্যপ্রদেশের খাণ্ডওয়া শহরে কুণ্ড নামে পরিচিতি পেয়েছে অনেক পুকুর। হৌজ-এর একটি অন্যতম উদাহরণ হলো দিল্লীর হৌজখাস, যা এখন পুকুরের চেয়ে পাড়া হিসেবেই বেশী পরিচিতি পেয়েছে।

তাল অনেক জায়গাতেই রয়েছে তবে এর সঙ্গে মিল রয়েছে এমন একটি শব্দ 'চাল' যা এক জায়গাতেই সীমিত হয়ে গেছে। এই জায়গাটি হলো উত্তরপ্রদেশের হিমালয়। এই পাহাড়ি জেলাগুলিতে অতীতে গ্রামে গ্রামে চাল ছিলো। সমভূমি অঞ্চলে গ্রাম বা শহরে পুকুরগুলি, জনবসতির মাঝে বা কাছাকাছি করা হয়, কিন্তু পাহাড়ি গ্রামগুলিতে 'চাল' গ্রাম থেকে কিছুদূরে ওপরে তৈরী করা হতো। চালগুলি সরাসরি খাবার জলের জন্য ব্যবহার করা হতো না ঠিকই কিন্তু চালগুলির জন্যই গ্রামের ঝর্ণা-গুলিতে সারা বছর জল পাওয়া যেতো। পাহাড়ে বর্ষার বেগ সামলাতে, হঠাৎ আসা বন্যা আটকাতে ও সারা বছরের জলের চাহিদা মেটানোর জন্য, চালের প্রচলন এত বেশী ছিলো যে গ্রাম নিজের ওপরের পাহাড়ে তিরিশ থেকে চল্লিশটা পর্যন্ত চাল তৈরী করতো।

লাল কেল্লার কাছেই
তৈরী হয়েছিলো লালডিগ্গী

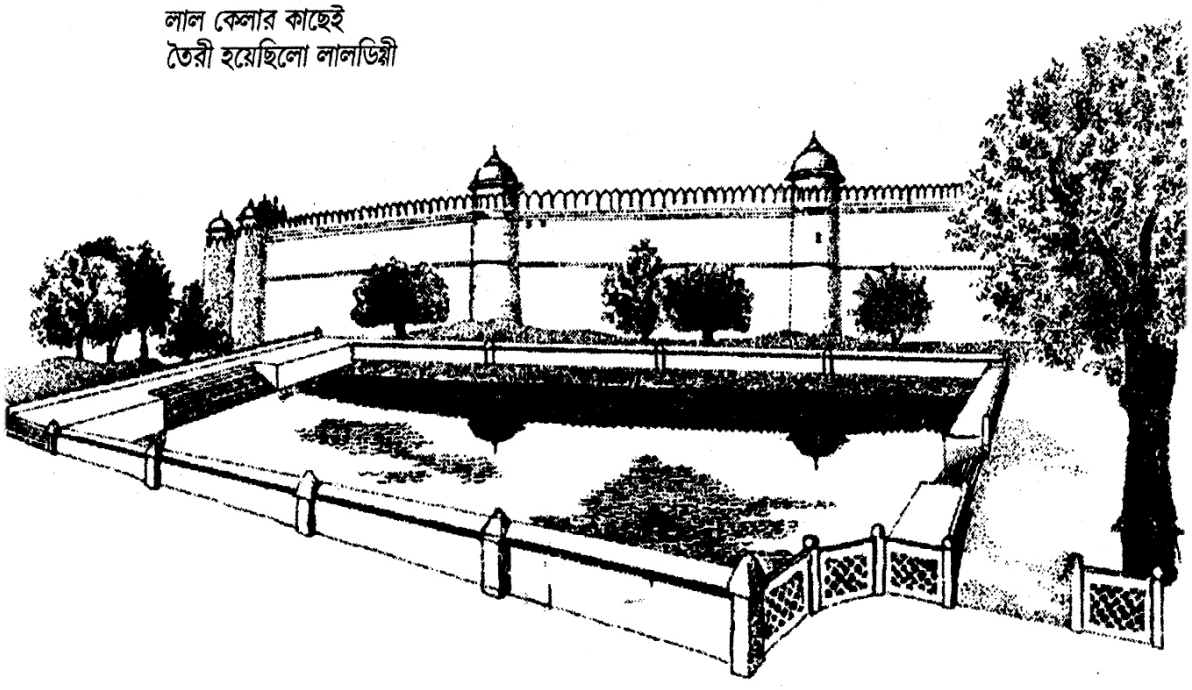

চাল প্রায় তিরিশ হাত লম্বা, একই রকম চওড়া ও চার পাঁচ হাত গভীর হতো। এটা কোন এক পক্ষের দায়িত্বে থাকতো না। সকলেই চাল তৈরী করতে জানতেন, সকলেই হাত লাগাতেন পরিষ্কারের কাজেও। চাল নিস্তারের কাজে লাগতো। গ্রামের পশু ছাড়াও বন্যপশুদেরও পানীয় জলের যোগান দিতো।

হিমালয়ে চাল কোথাও কোথও খাল হয়েছে। আবার কোথাও তোলি তো আবার কোথাও চৌরা। আশপাশের গ্রামগুলিও পরিচিতি পেতো এই নামেই। যেমন - উফরেখাঁল, রানীচৌরা, দূধাতোলি। উত্তরের এই শব্দই দক্ষিণ ভারত পৌঁছে কেরালায় চৈর ও অন্ধপ্রদেশে চেবরু শব্দে পরিণত হয়েছে।

চৌকো পাকা ঘাটে ঘেরা পুকুরকে চোপরা, চৌপরা আবার 'র', 'ড়' হয়ে কোথাও কোথাও চৌপড়াও বলা হয়। চৌপড়া উজ্জয়িনীর মতো প্রাচীন শহরে, ঝাঁসির মতো ঐতিহাসিক শহরে বা চিরগাঁও-এর মতো সাহিত্য প্রধান জায়গাতেও পাওয়া যাবে।

চৌপরার সঙ্গে মিল রয়েছে এমন আরও একটি নাম চৌঘরা। চারিদিকে পাকা ঘাট দিয়ে ঘেরা পুকুরকে চৌঘরা বলে। এই রকমই আরও একটি নাম তিঘরা। এতে একদিক সম্ভবত আগৌরের দিকটা কাঁচা রাখা হতো। তিনঘাট ও চারঘাট থেকে এগিয়ে আটঘাটি, অর্থাৎ যার আটটা ঘাট। আলাদা আলাদা ঘাটের ব্যবহারও ছিলো আলাদা আলাদা। কোথাও আলাদা জাতের জন্য আলাদা পুকুর থাকতো, আবার কোথাও একই পুকুরে নির্দিষ্ট থাকতো আলাদা ঘাট। এর মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষদের জন্য স্নানের আলাদা ব্যবস্থা। ছত্রিশগড়ে মেয়েদের জন্য ছিলো ডৌকি ঘাট, আর ছেলেদের জন্য ঘাট- ডৌকা। কোনো ঘাটে গনেশজী বিসর্জিত হতেন তো কোন ঘাটে মা-দুর্গা ; আবার কোনোঘাটে হয়ত বা তাজিয়া। সবার আলাদা ঘাট। এই ভাবেই পুকুরে হয়ে যেতো আট ঘাট এবং তাকে বলা হতো আটঘাটি।

দূর থেকেই দেখতে পাওয়া যেতো আটঘাটি পুকুর ঝলমল করছে কিন্তু গুহিয়া পুকুর সেখানে পৌঁছানোর পরই দেখতে পাওয়া যেতো। গুহিয়া অর্থাৎ গুহায় লুকিয়ে থাকা পুকুর। এর আকার খুব ছোট, সাধারণত বর্ষার জল জমে নিজে নিজেই পুকুরের আকার নিতো। বিহারে দুটো গ্রামের মাঝে নির্জন জায়গায় এখনও গুহিয়া পুকুর দেখতে পাওয়া যায়।

নিজে নিজেই গড়ে ওঠা এইরকম পুকুরগুলির আরও একটি নাম অমহাতাল। ছত্রিশগড়ীতে অমহা শব্দের অর্থ অনায়াস (স্বভাবিকভাবে)। গ্রামের সঙ্গে লাগোয়া ঘন বনে প্রাকৃতিকভাবে নীচু জমিতে এইরকম পুকুর স্বাভাবিক ভাবেই পাওয়া যায়। সাধারণত যাঁরা ঐ রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন তাঁরা এই পুকুরগুলিকে কিছুটা ঠিকঠাক করে ব্যবহারযোগ্য করে নেন।

চৌপড়া - চারটি-ই পাকা ঘাট

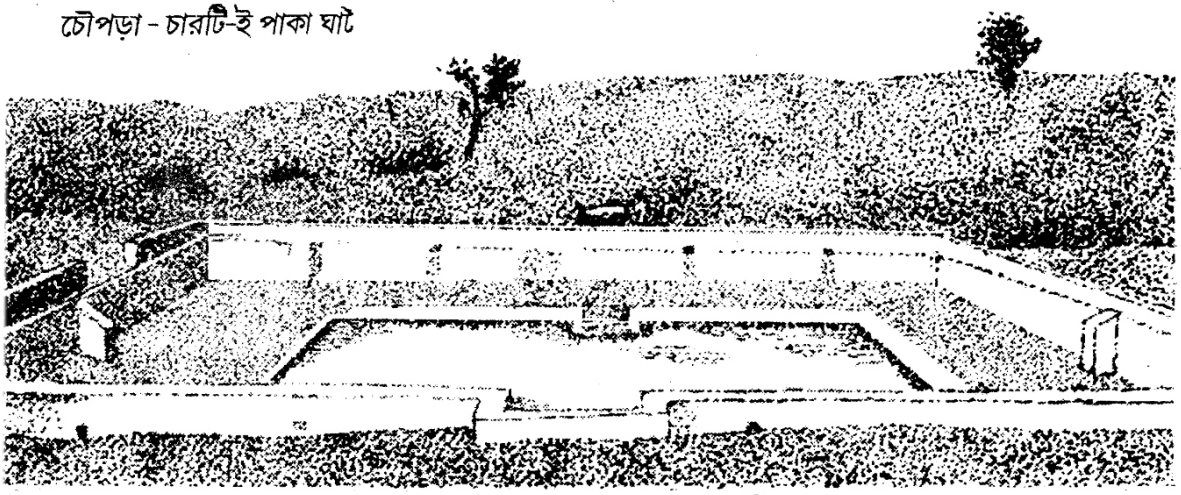

অমহা শব্দের আরও এক অর্থ আম। আমের গাছ দিয়ে, বড় বড় আমের বাগান দিয়ে ঘেরা পুকুর কে 'অমহা তরিয়া তাল' বা 'আম তরিয়া' বলা হয়। এইরকমই আরও একটি নাম আমরোহা। এখন এটা একটা শহরের নাম কিন্তু একসময় আমের গাছ দিয়ে ঘেরা পুকুরের নাম ছিলো। কোথাও কোথাও এরকম পুকুরকে অমরাহ-ও বলা হয়েছে। অমরাহের মতোই রয়েছে 'পিপরাহ'। অর্থাৎ পুরো পুকুর পাড় জুড়ে বিশাল বিশাল অশ্বত্থ গাছ। অমরাহ, পিপরাহতে পাড়ে বা নীচে যত গাছই লাগানো হোক তা গোনা যেতো, কিন্তু 'লাখপেড়া' তাল থাকতো লক্ষ গাছে ঘেরা। লক্ষ - অর্থাৎ অগুণতি। কোথাও কোথাও এই রকম পুকুরকে লাখরাঁও বলা হয়েছে।

লাখরাঁকেও পিছনে ফেলে দেয় ভোপালতাল। ভোপালতালের বিশালতা তার আশপাশে বসবাসকারীর গর্বকে অহঙ্কারে বদলে দিয়েছে। প্রবাদে একে একমাত্র পুকুর বলা হয়েছে -- 'তাল তো তাল ভোপালতাল, বাকি সব তলৈয়া'। এই বিশাল পুকুরটির সংক্ষিপ্ততম বিবরণেও চমকে উঠতে হয়। একাদশ শতাব্দীতে রাজা ভোজ কতৃক নির্মিত এই পুকুর তিনশো পঁয়ষট্টি নালা নদী দিয়ে দুশো পঞ্চাশ বর্গমাইল জুড়ে বিস্তৃত ছিলো। মালওয়ার সুলতান হুসেন শাহ পনেরো শতাব্দীতে সামরিক কারণে এই পুকুরটি ভেঙ্গে ফেলেন। হুসেন শাহ-র পক্ষে এই কাজ যুদ্ধের চাইতে কম কিছু ছিলো না। ভোপালতাল ভাঙ্গার জন্য তাঁকে ফৌজ নামাতে হয়েছিলো। বিশাল ফৌজেরও এই কাজে সময় লাগে তিন মাস। এরপর তিনবছর এই পুকুরের জল বয়ে যেতে থাকলো, অবশেষে তল দেখা গেলো। কিন্তু এর আগরের পাঁক রইলো আরও প্রায় তিরিশ বছর! শুকোনোর পর এখানে চাষ শুরু হয়। তখন থেকে এখনো পর্যন্ত এখানে উন্নতমানের গমের ফলন হয়ে চলেছে।

বড়র কথা এখন থাক, আবার একটু ফেরা যাক ছোট পুকুরে। অগভীর, ছড়ানো ছোট আকৃতির পুকুরকে বলা হয় চিখলিয়া। এই নাম চিখড় অর্থাৎ কিচড় (কাদা) থেকে এসেছে। এই রকম পুকুরের একটা পুরোনো নাম - ডাবর। এখন এটি শুধু মাত্র

ডাবরা (ডোবা) শব্দের মধ্যেই বেঁচে রয়েছে। বাই বা বায়ও এইরকমই ছোট পুকুরেরই নাম। অবশ্য পরে এই নামটি পুকুর থেকে সরে এসে বাউড়িতে আটকায়। দিল্লীতে কুতুব মিনারের কাছে রাঞ্জো-দের বায় নামক বাউড়ি আজ এই শব্দটির মতোই পুরনো হয়ে গেছে।

পুরনো হয়ে যাওয়া নামের তালিকায় নিওয়ান, হ্রদ, কাসার, তড়াগ, তাম্রপর্ণী, তালি, তল্ল প্রভৃতি শব্দগুলিকেও স্মরণ করা যেতে পারে। এর মধ্যে 'তল্ল' এমন একটি নাম যা দীর্ঘ সময় পার করেও বাংলা [১] ও বিহারে 'তল্লা' রূপে আজও টিকে রয়েছে। এরকমই একটি পুরোনো শব্দ 'জলাশয়', যা ডুবে গিয়েও সরকারি সেচ বিভাগের কল্যাণে আবার উঠে এসেছে। অনেক জায়গাতেই খুবই পুরোনো পুকুরের পুরোনো নাম যা সমাজ মনে রাখার যোগ্য বলে মনে করেনি, তা ক্রমে ক্রমে মুছে গেছে এবং তার আবার নতুন নাম দেওয়া হয়েছে। পুরনৈহা - অর্থাৎ বহু পুরোনো পুকুর। আশপাশের পুকুরের তুলনায় একেবারে প্রথমে তৈরী নৈতালকে একসময় নয়াতাল বলা হতে লাগলো। পুরোনো হয়ে গেলেও কিন্তু এটি এই নামেই পরিচিত থাকবে।

গুজকুলিয়া বলা হয় এমন পুকুরকে যা ছোট কিন্তু পাড় থেকেই গভীর। পল্বলও এই রকমই গভীর পুকুরেরই নাম। সময়ের তীব্র গতিতে এই নামও পিছনে পড়ে গিয়েছে। আজ এই নাম বেঁচে রয়েছে দিল্লীর কাছে পলওল নামে ছোট্ট একটা শহর ও স্টেশনের নামে, যে স্টেশনে ট্রেন না দাঁড়িয়েই চলে যায়!

খুদতাল ছত্রিশগড়ে এমন এক পুকুরকে বলা হয় যেটির জল ঝকঝকে পরিষ্কার ও পানীয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পনখতি পুকুর শুধুমাত্র নিস্তারের কাজে লাগে। এই রকমই লোণ্ডয়াতাল ও খুরতাল। এগুলি নিস্তার, সেচ ও পশুদের পানের কাজে লাগতো।

আলাদা আলাদা ভাবে তৈরী পুকুর ছাড়াও কোথাও কোথাও একটিকে অন্যটির সঙ্গে জুড়ে পুকুর শৃঙ্খল তৈরী হতো। প্রথমটার অতিরিক্ত জল দ্বিতীয়টায়। দ্বিতীয়টার তৃতীয়টায় - এরকম ব্যবস্থা কম বৃষ্টিপাতের জায়গা রাজস্থান ও অন্ধ্রের রায়লসীমা এলাকায়, আবার সাধারণ বৃষ্টিপাতের জায়গা বুন্দেলখণ্ড বা মালওয়াতে এমনকী অধিক বৃষ্টিপাতের এলাকা গোয়া, কোঙ্কনেও সমভাবে পাওয়া যায়। উত্তরে এর নাম সাঁকল বা সাঁখল এবং দক্ষিণে বলা হয় দশফলা পদ্ধতি।

পুকুরের এই শৃঙ্খল মোটামুটিভাবে দুই থেকে দশ পর্যন্ত চলে। শৃঙ্খল যদি দুটি পুকুরের মধ্যে হয় তো তাকে ছিপলাই বলে। অর্থাৎ বড় তাল-এর পিছনে লুকিয়ে যাওয়া তলাই। যে পুকুরটা সামনে রয়েছে, দেখতেও খুব সুন্দর, তার নাম যাই হোক

না কেন সেটিকে সগুঁরি তলাই বলা হতো। যে পুকুরে কুমীর থাকতো সে পুকুরের নাম যত বড় রাজার নামেই হোক না কেন, মানুষজন নিজেদের সাবধানতার জন্য, শিক্ষার জন্য মগরাতাল নামেই ডাকতো। অথবা নকয়াতাল বা নকরাতাল। নকরা শব্দ সংস্কৃত নক্র অর্থাৎ কুমীর থেকে এসেছে। কিছু জায়গায় গাধয়াতাল পাওয়া যায়। গাধয়াতালে কুমীরের মতো গাধা অবশ্যই থাকতো না। গাধা তো বোঝা বয়। মোটা দড়ির যতটা বোঝা গাধা বইতে পারে সেই দড়ির দৈর্ঘ্যের সমান গভীর পুকুরকে গাধয়াতাল বলা হয়েছে। পুকুরের পুরনো নাম মুছে যাওয়ার পিছনে কখনো ঘটে যাওয়া কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনাও পাওয়া যায়। এখানে ওখানে নাম শোনা যায় ব্রাহ্মণমারা তাল। ব্রাহ্মণমারা তালের অবশ্যই অন্য কিছু নাম ছিলো; হয়তো বা কোন ব্রাহ্মণ সেখানে কোন দুর্ঘটনায় পড়েন আর তারপর থেকে সেটিকে ব্রাহ্মণ মারার মতোই স্মরণ করা হয়। এ রকমই আর একটি নাম বৈরাগী তাল। এর পাড়ে বসেই বোধহয় কেউ কখনো বৈরাগী হয়ে যায়।

নদীর ধারে পাওয়া যায় নদেয়াতাল। নদেয়াতাল আগৌরের জলে নয় বন্যার জলে ভরতো। নদীর জলের বদলে ভূগর্ভস্থ কোন স্রোতের সঙ্গে যুক্ত পুকুরকে বলা হতো ভুঁইফোঁড় তাল। ভুঁইফোঁড় পুকুর সেসব জায়গাতেই বেশী ছিলো যেখানে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর যথেষ্ট ওপরে। উত্তর বিহারে এইরকম পুকুর অনেক ছিলো, কিছু নতুনও করা হয়েছে।

যে সময়টায় পুকুরের রক্ষণাবেক্ষণ খুব ভালোভাবেই করা হতো সেই সময়ও কোন না কোন কারণে এক-আধটা পুকুর সমাজের ব্যবহারের অনুপযোগী হয়েই পড়তো। এইরকম পুকুরকে বলা হতো হাতীতাল। 'হাতী' শব্দ সংস্কৃত হত শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ হলো নষ্ট হয়ে যাওয়া। 'হত তেরে কী'-র মতো সাধারণ ব্যবহারেও এই শব্দ হত তেরে ভাগ্য কী - অর্থাৎ তোর ভাগ্য নষ্ট হয়ে যাক, এরকম অর্থই বোঝাতো। আর এইভাবেই হাতীতাল নাম দেওয়া হয় পরিত্যক্ত পুকুরগুলির। 'হাতিতাল' কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন নাম। এতে বোঝাতো এমন পুকুর যার গভীরতা হাতির মতো। আরো একবার ফেরা যাক হাতীতালে। এই নাম সংস্কৃত থেকে দীর্ঘ যাত্রাপথে যদি কখনো ক্লান্ত হয়ে পড়ছে, তাহলে টাটকা নাম বেরিয়ে এসেছে চলিত কথা থেকেই। যেমন ফুটাতাল, ফুটেরাতাল ...।

যে পুকুরে বসার জায়গা করা হতো, গাঁয়ের বরযাত্রীও সেখানে দশ-বারো বার বসানো হয়েছে তার নাম হয়ে যেতো বরাতীতাল। অবশ্য বিহারে মিথিলার দুল্‌হাতাল একটি বিশেষ পুকুর। মিথিলা সীতাজীর বাপের বাড়ি। তাঁর স্বয়ম্বরের স্মৃতিতে এখনও সেখানে স্বয়ম্বর হয়। তফাৎ একটাই এখন আর পাত্র নির্বাচন কন্যা করে না, করে

কন্যাপক্ষ। দুল্‌হাতালে নির্দিষ্ট তিথিতে অনেক ছেলেপক্ষ নিজেদের ছেলে নিয়ে জড়ো হন। কন্যপক্ষের লোকেরা তাদের মধ্য থেকে নিজেদের কন্যার জন্য যোগ্য পাত্র বেছে নেন। ছত্রিশগড়েও এইরকম কিছু পুকুর রয়েছে। ওখানে সেগুলোর নাম দুল্‌হারাতাল।

অনেক পুকুরের নামের পিছনেই লম্বা কাহিনী পাওয়া যায়। পুকুরগুলি দীর্ঘসময় মানুষের সেবা করেছে আর মানুষও দীর্ঘসময় ধরে এই কাহিনীগুলি হুবহু মনে রেখেছে। এই পুকুরগুলির মধ্যে একটি বিচিত্র নাম হলো ' হা হা পঞ্চকুমারীতাল'। বিহারে মুঙ্গেরের কাছে একটি উঁচু পাহাড়ের তলায় এই পুকুরটি রয়েছে। গল্পে রাজা আছেন, রাজার পাঁচ মেয়ে। কোন কারণে পাঁচটি মেয়েই উঁচু পাহাড় থেকে পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেয়। পাঁচ রাজকন্যার শোকে মানুষ পুকুরের আসল নাম ভুলে যান এবং হা হা পঞ্চকুমারী নামই আজও স্মরণে রেখেছেন।

বিহারেরই লখিসরায় অঞ্চলের আশপাশে কোন একসময় তিনশো পঁয়ষট্টিটা পুকুর এক ঝটকায় তৈরী হয়েছিলো। গল্পটিতে কোন এক রানীর কথা পাওয়া যায়। যিনি নাকি প্রতিদিন নতুন পুকুরের জলে স্নান করতে চাইতেন। এই অদ্ভুত অভ্যাসে সারা এলাকা পুকুরে ভরে যায়। এই গল্পের শ'খানেক পুকুর এখনও সেখানে রয়েছে এবং তাই সেখানের জলস্তরও যথেষ্ট ওপরে।

যে সময়টায় পুকুরের রক্ষণাবেক্ষণ খুব ভালোভাবেই করা হতো সেই সময়ও কোন না কোন কারণে এক-আধটা পুকুর সমাজের ব্যবহারের অনুপযোগী হয়েই পড়তো। এই রকম পুকুরকে বলা হতো হাতীতাল 'হাতী' শব্দটি সংস্কৃত থেকে এসেছে। যার অর্থ নষ্ট হয়ে যাওয়া। 'হত তেরে কী'-র মতো সাধারণ ব্যবহারেও এই শব্দ হত তেরে ভাগ্য কী - অর্থাৎ তোর ভাগ্য নষ্ট হয়ে যাবে, এরকম বোঝাতো।

পোখর সাধারণত ছোট পুকুরকেই বোঝাতো তবে বরসনা(মথুরা)-তে এটি বড় পুকুরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়েছে। রাধার হাতের হলুদ ধোয়া প্রসঙ্গে কথিত আছে যে তাতে নাকি পোখরার জল হলুদ হয়ে গিয়েছিলো। তাই নাম হয় পিলীপোখর।

রং থেকে আসা যাক স্বাদে। মহারাষ্ট্রের মাহড় এলাকায় পুকুরের জল এতো স্বাদু যে তার নাম দেওযা হয় চাওদারতাল। চাওদার অর্থাৎ জাইকেদার(স্বাদু)। সমাজ

যখন পতনের মুখে তখন কয়েকটা 'নীচুজাতি'র জন্য এই পুকুর ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই চাওদারতাল থেকেই ১৯৭২ সালে ভীমরাও আম্বেদকর অচ্ছুতদের উদ্ধারের জন্য আন্দোলন শুরু করেন।

বিচিত্র পুকুরের তালিকায় আবু পর্বত (রাজস্থান)-এর নখী সরোবরও বাদ যায় না। এই সরোবরটি সম্পর্কে বলা হয় দেবতা ও ঋষিরা নখ দিয়ে খুঁড়েছিলেন এই পুকুর। কিন্তু যে সমাজে সাধারণ মানুষও পুকুর তৈরীতে পিছিয়ে থাকে না সেখানে দেবতাদের যোগদান শুধুমাত্র একটা পুকুরে কিভাবে সীমাবদ্ধ থাকবে।

গাড়োয়ালে সহস্রতাল নামক এলাকায় সত্যি সত্যি সহস্র পুকুর রয়েছে। হিমালয়ের এই এলাকাটি দশ থেকে তেরো হাজার ফুট ওপরে। এখানে এখন প্রকৃতির এক রূপ(বনস্পতি) বিদায় নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে ও অন্যরূপ(বরফ) রাজত্ব প্রতিষ্ঠার। আশপাশে দূর দূর পর্যন্ত কোন বসতি নেই। নিকটতম গ্রাম পাঁচ হাজার ফুট নীচে, সেখানকার লোকেরা বলে সহস্রতাল আমাদের নয় দেবতাদের তৈরী।

বিচিত্র ঘটনার মধ্যদিয়ে যাওয়া পুকুরগুলির মধ্যে সচিত্র বর্ণনা করার মতো হলো জয়পুরের পাশে তৈরী গোলতাল। এর আকৃতি গোলাকার তাই এর নাম গোলতাল, -এরকম নয়। একটি তোপের গোলা থেকে এই তাল তৈরী হয়েছিলো বলে কথিত আছে। তখনও জয়পুর শহর গড়ে ওঠেনি রাজধানী ছিলো আমের। জয়বাণ নামে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এক কামান তৈরী করেন জয়গড়ের রাজা। কামানটি জয়গড় কেল্লার ভেতরেই তোপ কারখানায় ঢালাই হয়েছিলো। এটির গোলা গিয়ে পড়তো কুড়ি মাইল দূরে। কামানটির ক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্য কেল্লারই কোন একটি মিনারে চড়িয়ে এটিকে দাগা হয়। গোলা গিয়ে পড়ে কুড়ি মাইল দূরে চাকসু নামক স্থানে। বিস্ফোরণ এত ভারী ছিলো যে লম্বা-চওড়া-গভীর বিশাল গর্ত হয়ে যায়। পরের বর্ষায় জল ভরে যায় এবং এরপর আর কখনো শুকায়নি। এই ভাবে জয়বাণ কামান তৈরী করলো গোলতাল। কামানটি আর কখনো চালানো হয়নি। পরীক্ষার পরই শান্তি স্থাপিত হয়। শোনা যায় এরপর আর কেউ সেদিকে হামলা করতে সাহস করেনি। গোলতাল এখনও চাকসু শহরকে জল দিয়ে চলেছে। পারমাণবিক শক্তির শক্তিমান পরীক্ষা এর পরও অনেক জায়গায় অনেকবার হয়েছে। এই রাজস্থানেই তো পোখরানে হলো। কিন্তু কোন গোল তাল তৈরী হয়নি। যদি হতোও, তাহলে হয়তো না হওয়ার থেকেও বেশী ক্ষতি হতো তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলে।

কখনে কখনো কোন একটি পুকুর অন্যগুলির তুলনায় মানুষের মনে বেশী প্রভাব ফেলে। তখন তা হয়ে যায় ঝুমরতাল। ঝুমর(ঝুমকা) মাথায় পরার একপ্রকার গহনা।

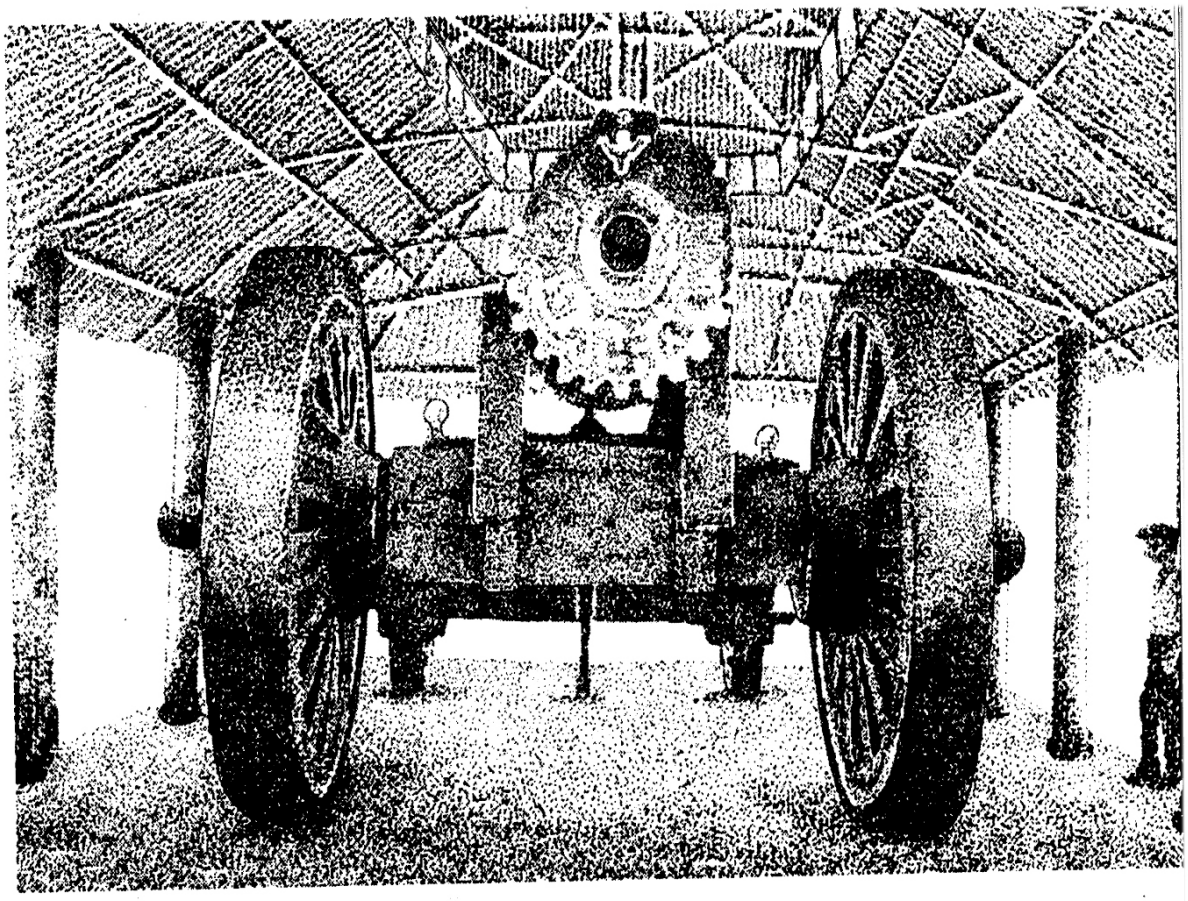

এই জয়বাণের গোলা থেকেই তৈরী হয়েছিলো গোলতাল

ঝুমরতাল বস্তুত সেই জায়গার মাথা উঁচু করে দিতো। তাই ভালোবেসে যেমন বেটাকে কখনে কখনো বিটিয়া বলা হয়, সেইরকম ঝুমুরিতলৈয়া। সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে এক ঝুমুরিতলৈয়ার নাম বিবিধভারতীর কল্যাণে ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছিলো।

ভারতীয় ভাষার বিভিন্নতা, তাল তলৈয়ার বিভিন্নতা সমাজের মাথা উঁচু করতো।

১। বাংলায় যে সমস্ত নামগুলি প্রচলিত রয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেযোগ্য - হাপা, ডোবা, গড়্যা (রাঢ়বাংলায় প্রচলিত), বিল, দীঘি, সায়র বা সায়ের, পুকুর বা পোখর, বাঁধ, তড়াগ, চাকা প্রভৃতি।

মরীচিকাকে মিথ্যা করে পুকুর

এই সকল মানুষজন, যাঁরা সারা দেশ জুড়ে জলের কাজ করতেন মরুভূমিতে এলেই তাঁদের মাথা মরীচিকায় ঘেরা হয়ে যায়।

সবথেকে গরম ও সবথেকে রুক্ষ হলো এই অঞ্চলটাই। মাত্র তিন থেকে বারো ইঞ্চি বৃষ্টি হয় সারা বছরে। জয়সলমের, বাড়মের ও বিকানের-এর কিছু অংশে এটুকুই বৃষ্টি হয়। এটুকু বৃষ্টি দেশের অনেক জায়গায় এক দিনেই হয়ে যায়। নিজের পূর্ণ তেজ নিয়ে সূর্য এখানে সবথেকে বেশী উজ্জ্বল। মনে হয় গ্রীষ্ম ঋতু এখান থেকেই তার পরিক্রমা শুরু করে। এরপর বিভিন্ন রাজ্যে হাজিরা দিয়ে এসে ফের এখানে জাঁকিয়ে বসে। তাপমাত্রা পঞ্চাশ ডিগ্রী না ছুঁলে মরুভূমির মানুষদের তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা কমে যায়। ভূগর্ভস্থ জলের স্তরও এখানে সবথেকে নীচে। জলের অভাবই তো মরুভূমির স্বভাব। মরুভূমির মানুষ কিন্তু একে অভিশাপ নয়, প্রকৃতির খেলারই একটা বড় অঙ্গ বলে মনে করতেন এবং পাক্কা খেলোয়াড়ের মতোই পূর্ণ প্রস্তুতি সহকারে এই খেলায় অংশগ্রহণ করতেন।

চারিদিকে মরীচিকায় ঘেরা তপ্ত মরুভূমিতে জীবনের এক জীবন্ত সংস্কৃতির ভিত তৈরীর সময় এই সমাজ সম্ভবত জলের সঙ্গে সম্পর্কিত তুচ্ছাতিতুচ্ছ তথ্যও খুঁজেছে ও পরখ করে দেখেছে। জল সমস্যায় প্রতিটি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাঁরা খুজেছেন জীবনের রীত। মরীচিকাকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য এক এক জায়গা এক এক রকম ব্যবস্থা গ্রহন করেছে।

যেখানে পুকুর নেই, অর্থাৎ জল নেই, সেখানে গ্রামও নেই। পুকুরের কাজ আগে হবে তবেই তাকে কেন্দ্র করে গ্রাম বসবে। মরুভূমিতে শত শত গ্রাম পাওয়া যাবে যেগুলির নাম তাদের পুকুরের নাম দিয়েই। বিকানের জেলায় - বিকানের তহসিলে চৌষট্টিটি, কোলায়ত তহসিলে কুড়িটি এবং নোখা ক্ষেত্রে একশো তেইশটি গ্রামের নাম সর দিয়ে। 'নুনকরমসর তহসিল' - এই তহসিলটির নামই তো সর দিয়ে, এছাড়াও এই তহসিলে আরও পঁয়তাল্লিশটি গ্রামের নাম সর দিয়ে। অবশ্য বাকি যেসব গ্রামের নামে সর নেই সেখানও পুকুর পাওয়া যাবে। তবে দু-চারটে গ্রাম হয়তো এমনও

পাওয়া যেতে পারে যেগুলির নামে সর আছে কিন্তু সেখানে সরোবর নেই। গ্রামে সরোবর হবে - এরকম ইচ্ছা গ্রামের নামকরণের সময় অবশ্যই ছিলো। ঠিক যেমন ছেলের নাম রামকুমার বা মেয়ের নাম পার্বতী রাখার সময় মাতা-পিতা সন্তানদের মধ্যে এঁদের গুণ কামনা করেন।

অধিকাংশ গ্রামেই এই পূর্ণ হয়ে যাওয়া কর্তব্য আর যেখানে কোন কারণবশতঃ তা সম্ভব হয়নি তা নিকট ভবিষ্যতে পূর্ণ দেখার কামনা - মরুভূমির সমাজকে জলের ব্যবস্থায় এক বলিষ্ঠ সংগঠনে রূপান্তরিত করেছিলো।

রাজস্থানের এগারোটা জেলায় - জয়সলমের, বাড়মের, যোধপুর, পালি, বিকানের, চুরু, শ্রীগঙ্গানগর, ঝুঁঝনু, জাগৌর, নালৌর ও সিকর-এর সর্বত্রই বিস্তারিত মরুভূমি। তবুও মরুভূমিকে নিজের মধ্যে সীমিত করে নিয়ে সমস্যা সমাধান করে জয়সলমের, বাড়মের ও বিকানের। এই অংশেই দেশের মধ্যে সবথেকে কম বৃষ্টি হয়, সবথেকে বেশী গরম, আছে বালির ঝড়; আর ডানা মেলে এখানে ওখানে উড়ে বেড়ানো বিশাল বিশাল বালির টিলা। এই তিনটি জেলায় সবথেকে বেশী জলের অভাব হওয়ার

জল সমস্যায় প্রতিটি প্রতিকূল পরিস্থিতে
তাঁরা খুঁজেছেন জীবনের রীত।
মরীচিকাকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য
এক এক জায়গায় এক এক রকম ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

কথা। কিন্তু মরুভূমির এই জেলাগুলির একশো শতাংশ গ্রামেই জলের ব্যবস্থা রয়েছে। আদমসুমারীর কর্মীদেরও একথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়! অথচ এই ব্যবস্থা অধিকাংশ গ্রামেই মরুভূমির সমাজ নিজের হিম্মতে করেছিলো। শুধু তাই নয় এই ব্যবস্থা এমনই মজবুত ছিলো যে তীব্র উপেক্ষার দীর্ঘ সময় পার করেও এই ব্যবস্থা এখনও টিঁকে রয়েছে।

গেজেটিয়ারে জয়সলমেরের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা খুবই ভয়াবহ - এখানে একটাও বারমাসি নদী নেই, ভূগর্ভস্থ জল একশো পঁচিশ থেকে দুশো পঞ্চাশ ফুট গভীরে, কোথাও কোথাও এই গভীরতা চারশো ফুটেও গিয়ে পৌঁছায়, বর্ষা অবিস্মরণীয় রকমের কম, মাত্র ১৬.৪ সেন্টিমিটার[১]। বিগত সত্তর বছরের অধ্যয়নে বছরে তিনশো পঁষট্টি দিনের মধ্যে তিনশো পঞ্চান্ন দিনই শুকনো গোণা হয়েছে। অর্থাৎ একশো কুড়ি দিনের বর্ষা ঋতু এখানে নিজের সংক্ষিপ্ততম রূপে মাত্র দশ দিনের জন্যই আসে।

এ হিসেব-নিকেশ অবশ্য অধুনিক প্রজন্মের। মরুভূমির সমাজ সম্ভবত এই দশ

দিনের বর্ষায় কোটি কোটি বৃষ্টিবিন্দু অনুভব করেন এবং তাই তা সঞ্চয় করার কাজ ঘরে ঘরে, গ্রামে গ্রামে ও শহরেও শুরু করে দেন। এই তপস্যার পরিণাম - জয়সলমের জেলায় বর্তমানে পাঁচশো পনেরোটি গ্রাম আছে। এর মধ্যে তিপান্নটি গ্রাম বিভিন্ন কারণে উঠে গেছে। চারশো বাষট্টিটি গ্রামে বসতি রয়েছে। এই চারশো বাষট্টিটি গ্রামের মধ্যে একটি গ্রাম ছাড়া বাকি সবগুলিতেই পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে। যে গ্রামগুলো উঠে গেছে সেগুলোতে এখনও এই ব্যবস্থা টিকে রয়েছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী জয়সলমেরে ৯৯.৭৮ শতাংশ গ্রামেই কুয়ো পুকুর ও অন্যান্য জলের উৎস পাওয়া যায়। এর মধ্যে পাইপ, টিউবওয়েলের মতো নতুন ব্যবস্থা খুবই কম। ১.৭৩ শতাংশ গ্রামের অর্থ কী হয় জানি না, কিন্তু সীমান্তবর্তী এই জেলার পাঁচশো পনেরোটি গ্রামের মধ্যে শুধু ১.৭৩ শতাংশ গ্রামেই বিদ্যুৎ পৌঁছেচে। এর অর্থ দাঁড়ায় বেশীরভাগ জায়গাতেই টিউবওয়েল বিদ্যুতে নয় ডিজেলে চলে। তেল আসে বাইরে অনেক দূর থেকে। অর্থাৎ তেলের ট্রেকার না এলে পাম্প চলবে না এবং জল পাওয়া যাবে না। আর সবকিছু ঠিকঠাক চললেও আজ অথবা আগামী কাল টিউব-

সূর্য আজও ঘড়সাসরে
'মন' ভর সোনা
ঢেলে চলেছে

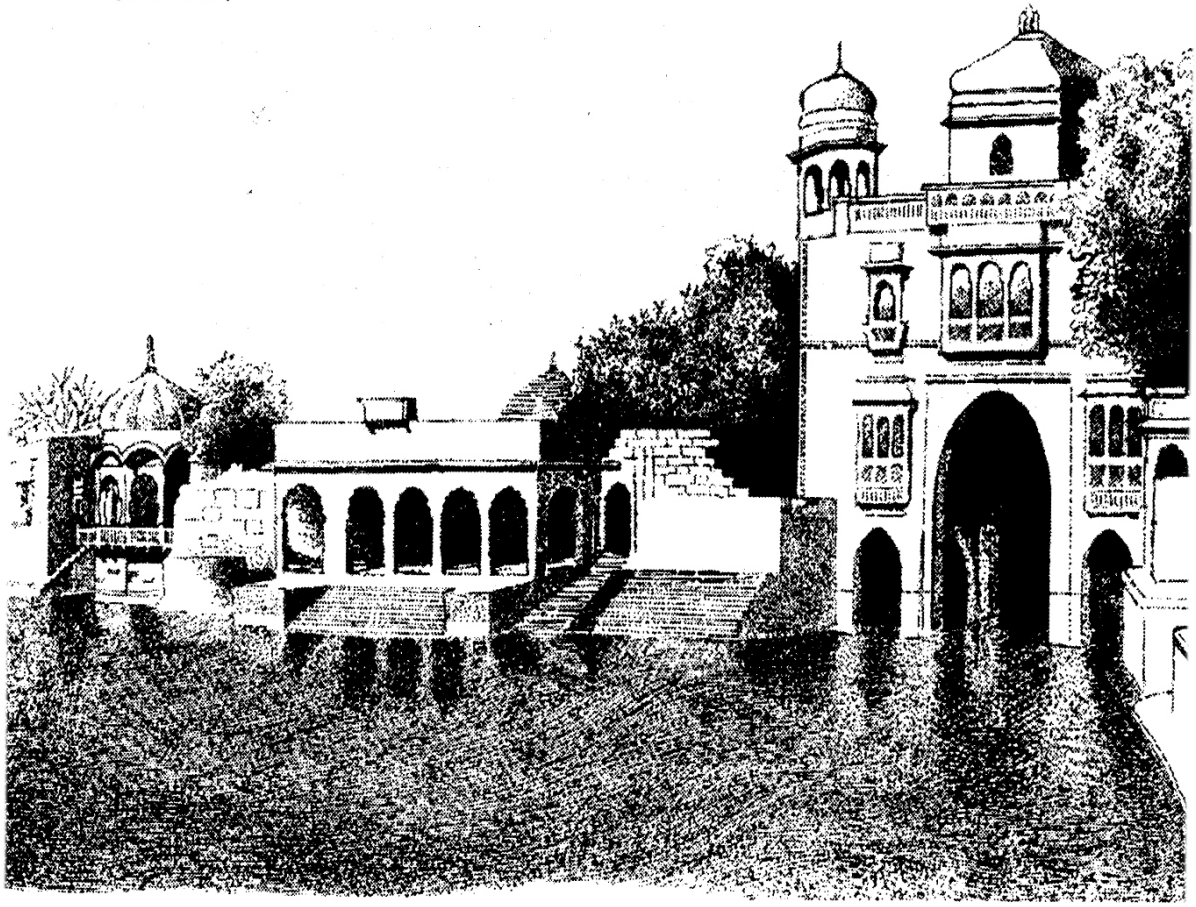

ওয়েল জলের স্তর নীচে নামাবেই। টিউবওয়েলে জল তোলা চলবে অথচ জলস্তর যথাস্থানে স্থির থাকবে এরকম উপায় তো এখনও উদ্ভাবন হয়নি।

আরও একবার বলে রাখি, মরুভূমির মধ্যে সবথেকে বিকট এই এলাকায় শতকরা ৯৯.৭৮ শতাংশ গ্রামে জলের ব্যবস্থা আছে এবং মরুভূমির সমাজ তা নিজের ক্ষমতাতেই করেছে। এরই সঙ্গে সেই সুবিধাগুলিও দেখে নেওয়া যাক, যেগুলির যোগাড় নব্য সমাজের নতুন সংস্থাগুলির বিশেষত সরকারের বলে মনে করা হয়। পাকা রাস্তার সঙ্গে মাত্র ১৯ শতাংশ গ্রামই যুক্ত হতে পেরেছে। ডাক প্রভৃতি পরিষেবা পৌঁছেচে শতকরা ৩০ভাগ গ্রামে। ডাক্তারি সুবিধে ৯ ভাগ গ্রামে। শিক্ষা ব্যবস্থা এগুলির তুলনায় কিছুটা ভালো - শতকরা ৫০ ভাগ।

ফেরা যাক জলের প্রসঙ্গে - পাঁচশো পনেরোটি গ্রামে ছয়শো পঁচাত্তরটি কুয়ো ও পুকুর রয়েছে। এর মধ্যে পুকুরের সংখ্যা দুশো চুরানব্বইটি।

যে জায়গাটিকে নতুন প্রজন্ম নিরাশার ক্ষেত্র বলে মনে করে, সেখানে সীমানার শেষ অংশে পাকিস্তানের কিছু আগে রয়েছে আশু তাল, অর্থাৎ আশার তাল। তাপমাত্রা যেখানে পঞ্চাশ ডিগ্রী ছুঁয়ে ফেলে সেখনে রয়েছে সিতলাঈ। শীতল তলাই। আর বর্ষা যেখানে সব থেকে বেশী বিশ্বাসঘাতকতা করে সেখানে বদরা-সর। মরুভূমিতে জলের কষ্ট নেই, ব্যাপারটা এরকম নয়। কিন্তু সেখানের সমাজ কখনো জলের কান্না কাঁদেনি। তাঁরা এই কষ্টকে কিছুটা সহজ করে নেওয়ার আশা রাখে এবং সেই আশার ভিত্তিতেই নিজেদের এমন সংগঠন তৈরী করেছে যেখানে একদিকে জলের প্রতিটি ফোঁটা সংগৃহীত হয় অতি যত্নসহকারে; আবার অন্যদিকে তার ব্যবহারও করা হয় যথেষ্ট বুঝে-সুঝে, মিতব্যয়িতার সঙ্গে।

এই সংগ্রহ ও মিতব্যয়িতার স্বভাবকে অনুভব করতে, বুঝতে পারেনি গেজেটিয়ার বা সেই গ্রন্থ যাদের প্রতিনিধিত্ব করে সেই প্রতিনিধিরা। তাই তারা এই সমাজকে, মরুভূমিকে - জনহীন, বিভৎস, জীবনহীন ও আনন্দহীন দেখেছে। কিন্তু গেজেটিয়ারে যারা এই কথা লিখেছিল তারাও যখন ঘড়সীসরে পৌঁছায় তখন এটা ভুলে যায় যে তারা মরুভূমি যাত্রায় রয়েছে।

কাগজে পর্যটন মানচিত্রে যত বড় শহর জয়সলমের প্রায় ততবড়ই পুকুর ঘড়সীসর। মানচিত্রের মতই মরুভূমিতেও এরা পরস্পরের সঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘড়সীসর ছাড়া জয়সলমের হতো না। প্রায় আটশো বছরের পুরোনো এই শহরের সাতশো বছরের প্রতিটি দিন ঘড়সীসরের এক একটি বিন্দুর সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ।

বালির এক বিশাল টিলা সামনে দাঁড়িয়ে। কাছে গেলেও মনে হবে না টিলা নয়

ঘড়সীসরের উঁচু-বিস্তৃত, লম্বা-চওড়া পাড়। আরও কিছুটা এগিয়ে গেলে দেখা যায় দুটো মিনার, পাথরের ওপর সুন্দর নক্‌শাদার পাঁচটা জানালা এবং দুটো ছোট ও একটা বড় থামের প্রবেশদ্বার মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বড় ও ছোট থামের সামনে নীল আকাশ ঝকঝক করছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলে প্রবেশদ্বার থেকে যতটা নজরে আসে, তার সঙ্গে নতুন নতুন দৃশ্য যোগ হতে থাকে। এই পর্যন্ত পৌঁছে বুঝতে পারা যাবে যে থাম থেকে যে নীল আকাশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছিলো তা আসলে সামনে ছড়িয়ে থাকা ঘড়সীসরের নীল জল! তারপর ডাইনে বাঁয়ে সুন্দর পাকা ঘাট, মন্দির, চাতাল, স্তম্ভ-ঘেরা সুসজ্জিত বারান্দা, ঘর, আরও না জানি কী কী। প্রতি মুহূর্তে বদলে যাওয়া দৃশ্য অতিক্রম করে পুকুরের কাছে পৌঁছে বিশ্রামের সময় চোখ সামনের দৃশ্যগুলিতে কোনো একটার ওপর স্থির হতে পারে না। চোখের মণি প্রতি মুহূর্তে ঘুরে ঘুরে ঐ বিচিত্র দৃশ্যকে মেপে নিতে চায়।

কিন্তু চোখ যে তা মাপবে সে সাধ্য তার নেই। প্রায় তিন মাইল লম্বা ও এক মাইল চওড়া আগরের এই পুকুরের আগৌর একশো কুড়ি বর্গমাইল ক্ষেত্রে বিস্তৃত। এটি জয়সলমেরের রাজা মহারাওল ঘড়সি তৈরী করিয়েছিলেন বিক্রম সংবত ১৩৯১ তে; অর্থাৎ ১৩৩৫ সালে। অনান্য রাজারাও পুকুর তৈরী করিয়েছেন কিন্তু ঘড়সি তো এতে নিজে অংশ গ্রহণ করেন। ঘড়সি প্রতিদিন সুউচ্চ কেল্লা থেকে নেমে আসতেন এবং খোঁড়া থেকে শুরু করে প্রতিটি কাজ নিজে দেখাশোনা করতেন। এই সময়টা জয়সলমেরের পক্ষে খুব একটা ভালো সময় ছিলো না। ভাটি বংশে গদির দখল নিয়ে অন্তর্কলহ, ষড়যন্ত্র ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে চলেছিলো। একদিকে মামা নিজের ভাগ্নের ওপর আঘাত হানছিলো, ভাই ব্যস্ত ছিলো ভাই-কে দেশ ছাড়া করতে, আবার কোথাও বা কারো খাবারে বিষ মেশানো হচ্ছিলো।

রাজবংশে নিজেদের মধ্যে কলহ তো ছিলোই, অন্য দিকে রাজ্য ও শহর জয়সলমেরও দেশী বিদেশী হামলাদারে ঘিরে ফেলছিলো যখন-তখন। পুরুষেরা বীরগতি প্রাপ্ত হচ্ছিলো, মেয়েরা নিজেরাই চিতা জ্বালিয়ে নিজেদের আহুতি দিচ্ছিলো।

এই রকম জ্বলন্ত সময় ঘড়সি নিজে রাঠোরের রাণার সাহায্য নিয়ে জয়সলমের অধিকার করেন। ইতিহাসে ঘড়সির কাল জয়-পরাজয়, বৈভব-পরাভব, মৃত্যুর ঘাট ও সমর সাগরের মতো শব্দে ভর্তি।

অথচ তখনও সেই সাগর তৈরী হচ্ছিলো। দীর্ঘ সময়ের এই পরিকল্পনায় কাজ করার জন্য ঘড়সি অশেষ ধৈর্য ও অপার সাধনপ্রাপ্ত করেছিলেন। এজন্য অবশ্য তাঁকে চূড়ান্ত মূল্যই দিতে হয়েছিলো। পাড় তৈরী হচ্ছে, মহারাওল পাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে সমস্ত কাজ দেখাশোনা করছেন। এরই মধ্যে রাজ পরিবারের ভেতরে চলা

ষড়যন্ত্র, পাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা ঘড়সির ওপর আক্রমণ করে। সে সময় রাজার চিতায় রাণীর সতী হওয়ার প্রচলন ছিলো। রাণী বিমলা সতী হলেন না। তিনি রাজার স্বপ্ন পূরণ করেন।

বালির এই স্বপ্নের দুটো রঙ রয়েছে। নীল রং জলের এবং হলুদ রঙ তিন-চার মাইল জুড়ে ছড়িয়ে থাকা পুকুরের অর্ধগোলাকার ঘাট, মন্দির, মিনার ও বারান্দার। দুটি রঙের এই স্বপ্ন কিন্তু দিনে দুবার একই রঙে রঙীন হয়ে ওঠে। উদিত ও অস্তগামী সূর্য ঘড়সীসরে 'মন' ভর সোনা ঢেলে দেয়। এ মন মাপ-জোক করার মণ নয়, সূর্যের ঠিক যতটায় মন ভরে ঠিক ততটাই।

মানুষও ঘড়সীসরে নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী সোনা নিক্ষেপ করেছিলো। পুকুর রাজার ছিলো কিন্তু প্রজারা সেটিকে সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করতে থাকে। প্রথম দফায় তৈরী হলো মন্দির, ঘাট এবং এভাবেই জল মহল বেড়ে চলে। যখন যাঁর যা কিছু ভালো মনে হয়েছে তা সে ঘড়সীসরকে সমর্পণ করেছে। রাজা প্রজার যুগলবন্দীতে ঘড়সীসর হয়ে ওঠে একঅপূর্ব সঙ্গীত ।

এক সময় ঘাটের ওপর পাঠশালাও করা হয়েছিলো। শহর বা আশপাশের গ্রামের ছাত্ররা এসে থাকতো এবং সেখানেই গুরুর কাছে জ্ঞানপ্রাপ্ত হতো। পাড়ের একপাশে ছিলো রান্নাঘর, থাকারঘর। গ্রাম থেকে লোক শহরে আসতেন কাছারি বা অন্যান্য কাজে। কিন্তু কাজ যদি একদিনে শেষ না হতো বা কোন কারণে আটকে যেতো তাহলে

প্রথমে জল, সঙ্গে অন্ন;
জৈতসরের অকৃপণ দান

তাঁরা সাময়িকভাবে এখানেই আশ্রয় নিতেন। নীলকণ্ঠ ও গিরিধারীর মন্দির, যজ্ঞশালা, জামালশাহ পিরের চৌকি সবকিছু একই ঘাটে। রোজগারের জন্য জয়সলমেরের বাইরে চলে গেছিলো যে সমস্ত পরবিারগুলি তাঁদেরও মন পড়ে থাকতো ঘড়সীসরে। জয়সলমের থেকে গিয়ে মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে ডেরা বেঁধেছিলেন শেঠ গোবিন্দদাসের পূর্বপুরুষ। দেশে ফিরে শেঠ গোবিন্দদাস এই পাঠশালে এক বিশাল মন্দির তৈরী করান।

সারা শহরের জল যেতো ঘড়সীসর থেকেই। সাধারণভাবে সারাদিনই এখান থেকে জলভরা চলতো, তবে সকাল ও বিকেলে জল ভরতে আসা মেয়েদের মেলা লেগে যেতো। এই দৃশ্য শহরে পাইপ আসার আগে পর্যন্ত দেখতে পাওয়া গেছে ১৯১৯ সালে ঘড়সীসরের ওপর রচিত উম্বেদসিংজী মেহেতার রচিত গজলে এই রকম দৃশের খুব সুন্দর বর্ণনা রয়েছে। ভাদ্রের উৎসব - তৃতীয়ার মেলায় সারা শহর সেজেগুজে ঘড়সীসরে পৌঁছাতো। শুধুমাত্র নীল ও হলুদ রঙের এই পুকুরে সমস্ত প্রকার রঙ চারদিকে ছড়িয়ে পড়তো।

ঘড়সীসরের জন্য মানুষের ভালোবাসা একতরফা ছিলো না। মানুষ ঘড়সীসরে আসতো, ঘড়সীসরও তাদের মনে পৌঁছে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছিলো। দূর সিন্ধু প্রদেশে বসবাসকারী টীলো নামের গণিকার মন সম্ভবত এরকমই কোন মুহূর্তে কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে।

পুকুরে ঘাট-পাট সবই ছিলো। ঠাটের কোন কম ছিলো না। তবুও টীলোর মনে হয় এত সুন্দর পুকুরে একটা সুন্দর প্রবেশদ্বারও থাকা দরকার। টীলো ঘড়সীসরের পশ্চিমঘাটে 'পোল' অর্থাৎ প্রবেশদ্বার করানোর সিদ্ধান্ত নেন। পাথরের ওপর সূক্ষ্ম নক্শাদার, সুন্দর জানালা দেওয়া বিশাল দ্বার পূর্ণ হয়েই এসেছিলো, এমন সময় কিছু লোক রাজার কাছে গিয়ে কান ভাঙানি দেয় - 'আপনি এক গণিকার তৈরী প্রবেশদ্বার দিয়ে ঘড়সীসরে প্রবেশ করবেন'! বিবাদ শুরু হয়ে যায় ওদিকে প্রবেশদ্বারে কাজ চলছে। এরপর রাজা এটি ভেঙ্গে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন। টীলো খবর পান। রাতারাতি প্রবেশদ্বারের সবথেকে উঁচু তলায় মন্দির তৈরী করিয়ে দেন। মহারাওল মত বদলান। তখন থেকেই সারা শহর এই সুন্দর প্রবেশদ্বার দিয়ে পুকুরে যাতায়াত করেন এবং সশ্রদ্ধায় এটিকে টীলোর নামের সঙ্গেই মনে রাখেন।

টীলোর প্রবেশদ্বারের ঠিক সামনে পুকুরের বিপরীতে চারিদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা গোল মিনার। পুকুরের বাইরে তো বাগান প্রভৃতি হয়ই, কিন্তু এই মিনারে পুকুরের ভেতর বাগান তৈরী হয়েছে। এখানে মানুষ 'গোঠ' অর্থাৎ আনন্দ-মঙ্গল করতে

আসতো। এরই সঙ্গে পূর্বদিকে চারদিক ঘেরা আরও একটা বড় গোল জায়গা ছিলো। সেখানে পুকুর রক্ষাকারী ফৌজ থাকতো। দেশী বিদেশী শত্রুতে ঘেরা রাজ্য সমস্ত মানুষকে জলপ্রদানকারী পুকুরের সুরক্ষারও ব্যবস্থা করেছিলো।

ঘড়সীসরের আগৌর এত বড় ছিলো যে মরুভূমিতে যত কম বর্ষাই হোক সেখানের প্রতিটি বৃষ্টি বিন্দু গড়িয়ে এসে পুকুরকে কানায় কানায় ভরিয়ে তুলতো। তখন পুকুরের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ফৌজের হাত থেকে বেরিয়ে নেষ্টার হাতে চলে যেতো। নেষ্টা বইতে শুরু করতো, যে অতিরিক্ত জল পুকুর ভেঙ্গে ফেলতে পারে তা বেরিয়ে যেতো। কিন্তু এই বয়ে যাওয়া ছিলো খুবই বিচিত্র। বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটা সংগ্রহ করে ঘড়সীসরকে ভরাতে জানতেন যাঁরা, তাঁরা এই এই অতিরিক্ত জলকে শুধুই জল নয়, জলরাশি মনে করতেন। নেষ্টা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া জল সামনে একদিকে একটা পুকুরে জমা করা হতো। ঘড়সীসরের নেষ্টা তখনও বইতে থাকলে জমা করা পুকুরের নেষ্টাও বইতে শুরু করতো। এই অতিরিক্ত জলও দ্বিতীয় একটা পুকুরে জমা করা হতো। এই ধারাবাহিকতা নয়টি পুকুর পর্যন্ত চলতো। নৌতাল, গোবিন্দসর, জোশিসর, গোপালসর,

ঘড়সীসরের জন্য মানুষের ভালোবাসা এরকমই ছিলো না।
মানুষ ঘড়সীসর আসতো, ঘড়সীসরও
তাদের মনে পোঁছে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছিলো।
দূর সিন্ধু প্রদেশে বসবাসকারী টাঁলো নামের গনিকার মন
সম্ভবত এরকমই কোন মুহূর্তে কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে।

ভাটিয়াসর, সূদাসর, মোহতাসর, রতনসর, কিষাণঘাট। এপর্যন্ত পৌঁছেও যদি জল বেঁচে যেতো তাহলে কিষাণঘাটের পর তাকে কিছু বেরিতে অর্থাৎ কুয়োর মতো ছোট ছোট কুণ্ডে ভরে নেওয়া হতো। জলের এক এক ফোঁটা যেন শব্দ ও বাক্যের মতো ঘড়সীসর থেকে কিষাণঘাট পর্যন্ত সাত মাইল লম্বা রাস্তায় নিজের ঠিক ঠিক অর্থ পেয়ে যেতো।

আজ যারা রাজ্য পরিচালনা করে, যাদের হাতে জয়সলমেরের ভার, তারা ঘড়সীসরের অর্থই ভুলে গেছে তো তার সঙ্গে যুক্ত নয়টি পুকুরের খেয়াল কী করে তাদের থাকবে! ঘড়সীসরের আগৌরে এখন বায়ুসেনার বিমানঘাঁটি হয়েছে। তাই আগৌরের জল এখন পুকুরের দিকে না এসে অন্য কোথাও বয়ে যায়। নেষ্টা ও তার রাস্তায় পড়ে যে নয়টি পুকুর তার আশপাশও আজ দ্রুতগতিতে বেড়ে ওঠা শহরের

পুকুরের ধারেই তৈরী হয় কুয়ো

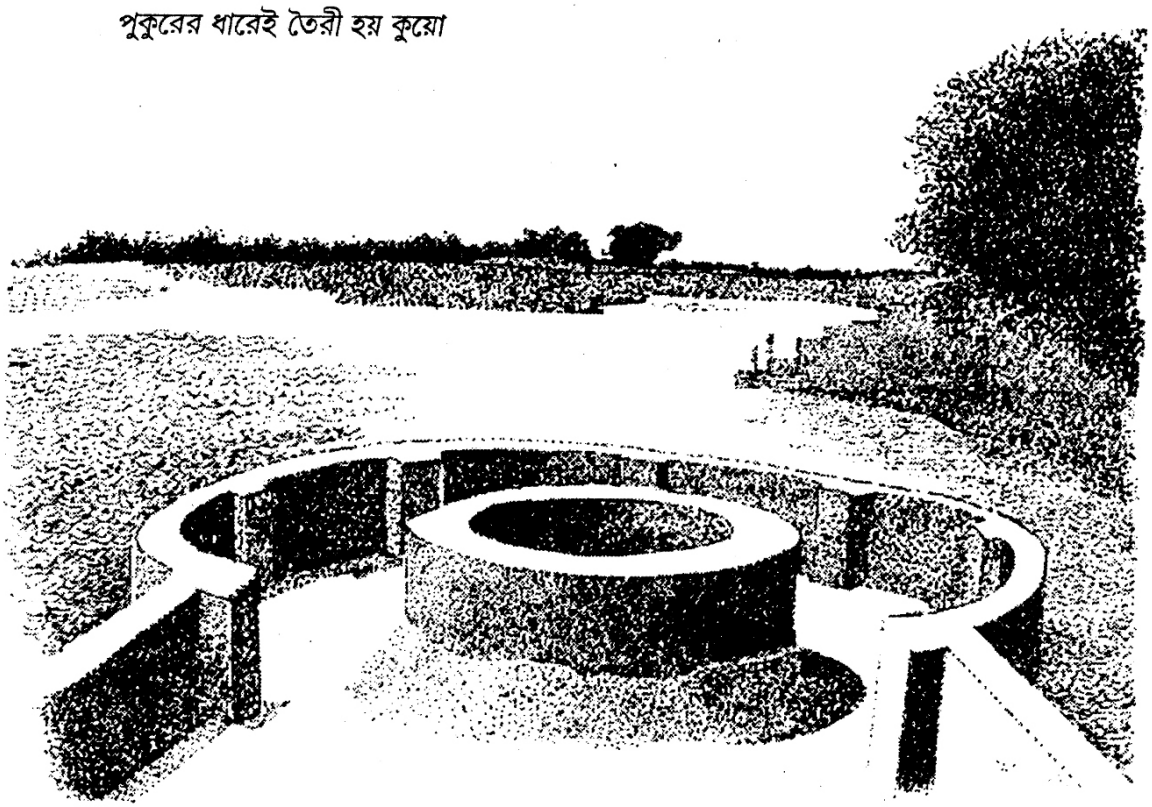

গৃহ এবং নতুন গৃহ নির্মান সমিতিগুলির, এমন কী জলের সমস্যা নিয়ে যারা নতুন কাজ করছে সেই ইন্দিরা প্রাধিকরণের অফিস হয়েছে এবং তাতে যারা কাজ করে তাদের কলোনি গড়ে উঠেছে।

ঘাট, পটসাল, পাঠশালা, রান্নাঘর, বারান্দা, মন্দির সবকিছুই যথার্থ দেখাশোর অভাবে আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শহর আজ আর লহ্াস খেলে না, যাতে রাজা-প্রজা সকলে মিলে ঘড়সীসরকে পরিষ্কার করতো, পাঁক বার করতো। পুকুরের ধারে স্থাপিত জলস্তম্ভও কিছুটা নড়বড়ে হয়ে একদিকে হেলে পড়েছে।

তবুও ছয়শো আটষট্টি বছরের ঘড়সীসর এখনও মরে যায়নি। যাঁরা ঘড়সীসর তৈরী করেছিলেন তাঁরা তাকে সময়ের থাপ্পড় সহ্য করার মতো মজবুত করেই করেছিলেন। মরুভূমির বালির ঝড়ের মাঝে নিজেদের পুকুরটিকে যাঁরা উন্নত রক্ষণাবেক্ষণে বেঁধেছিলেন সম্ভবত তাঁরা এটা জানতেন না যে কখনও উপেক্ষার ঝড়ও বইতে পারে। কিন্তু এই ঝড়কেও ঘড়সীসর ও যাঁরা ঘড়সীসরকে চান তাঁরা খুব ধৈর্য্যের সঙ্গে সহ্য করে চলেছেন। পুকুর পাহারা দেওয়ার জন্য আজ ফৌজ না থাকলেও মানুষের মনের পাহারা আজও রয়েছে।

সূর্যের প্রথম কিরণের সঙ্গে সঙ্গেই মন্দিরে ঘন্টা বেজে ওঠে। দিনভর মানুষ ঘাটে যাতায়াত করেন। কিছু মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা মৌন বসে ঘড়সীসরের দিকে চেয়ে

থাকেন, কেউ গান গান, কেউ 'রাবন হত্থা' (এক ধরণের সারেঙ্গী) বাজান।

মেয়েরা জল নেওয়ার জন্য আজও ঘাটে আসে। উটের গাড়িতেও জল যায়। এখন দিনে কয়েকবার সেখানে ট্যাঙ্কারও দেখা যায়, যাতে ঘড়সীসর থেকে জল ভরার জন্য ডিজেল পাম্প পর্যন্ত লাগানো থাকে।

ঘড়সীসর আজও জল দিয়ে চলেছে। আর সেইজন্য উদিত ও বিদায়ী সূর্য আজও মন ভর সোনা ঢেলে যায়।

ঘড়সীসর এক দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছিলো। এর পর আর কোথাও পুকুর করা কঠিন ছিলো বোধহয়। কিন্তু তবুও জয়সলমেরে প্রতি একশো বা পঞ্চাশ বছর অন্তর মানিক সম ঘড়সীসরের সঙ্গে মুক্তোর মতো গাঁথা হয়ে একের পর এক পুকুর হতে থাকে।

তবুও ছয়শো আটষট্টি বছরের ঘড়সীসর এখনও মরে
যায়নি। যাঁরা ঘড়সীসর তৈরী করেছিলেন তাঁরা তাকে
সময়ের থাপ্পড় সহ্য করার মতো মজবুত করেই করেছিলেন।
মরুভূমির বালির ঝড়ের মাঝে নিজেদের পুকুরটিকে যাঁরা
ঐমত রক্ষণাবেক্ষণে বেঁধেছিলেন সম্ভবত তাঁরা এটা
জানতেন না যে কখনও উপেক্ষার ঝড়ও বইতে পারে।

ঘড়সীসর থেকে প্রায় একশো পঁচাত্তোর বছর পর তৈরী হয় জৈতসর। বাঁধনের মতই পুকুর ছিলো জৈতসর। তবে সংলগ্ন বিশাল বাগানের জন্য পরে একে 'বড়াবাগ'-এর মতোই মনে রাখা হয়েছে। এই পাথরের বাঁধ জয়সলমেরের উত্তর দিকের খাড়া পাহাড় থেকে আসা সমস্ত জল আটকে রেখেছে। একদিকে জৈতসর ও অন্যদিকে রয়েছে এই জল থেকেই সিঞ্চিত 'বড়াবাগ'। এ-দুটিকে পৃথক করে রেখেছে বাঁধের দেওয়াল। তবে এটিকে দেওয়াল নয় বড়সড় চওড়া রাস্তা মনে হয়। যা ঘাটি পার করে সামনের রাস্তা পর্যন্ত চলে গেছে। দেওয়ালের নীচে সেচনালার নাম রামনাল।

রামনাল নহর, বাঁধের দিকে সিঁড়ির মতো। জৈতসরে জলের স্তর বেশী হোক বা কম, নহরের এই সিঁড়ির মতো গঠন, জল বড়াবাগের দিকে নামিয়ে নিয়ে যায়। বড়াবাগে পৌঁছে রামনাল রামের নামের মতই কোণায় কোণায় ছড়িয়ে পড়ে। নহরের প্রথম কিনারে একটা কুয়োও রয়েছে। জল শুকিয়ে গেলে বা নহর বন্ধ হয়ে গেলে চুঁইয়ে পড়া জলে ভর্তি এই কুয়ো ব্যবহার হয়। ওদিকে আগরের জল শুকিয়ে গেলে গম বুনে দেওয়া হয়। তখন বাঁধের দেওয়ালের দু-দিকই সবুজ আর সবুজ!

'হারাবাগ' সত্যি সত্যি খুবই বড়। বিশাল উঁচু আমের বাগান ও তার সঙ্গে বিভিন্ন ধরণের গাছপালা। অধিক বৃষ্টিপাতের এলাকায় নদীর ধারে সাধারণত যে ধরণের বড় বড় অর্জুন গাছ পাওয়া যায়, বড়াবাগে তাও পাওয়া যাবে। সূর্যের কিরণ বড়াবাগের গাছের পাতায় আটকে থাকে। হাওয়া দিলে পাতা নড়ে, সুযোগ বুঝে ফাঁক ফোকর দিয়ে কিছুটা কিরণ ঢুকে পড়ে। বাঁধের ওপাশে রাজবংশের শ্মশান। সেখানে স্বর্গতদের উদ্দেশ্যে সুন্দর ছত্র করানো রয়েছে।

ঘড়সীসরের তিনশো পঁচিশ বছর পর তৈরী হয় অমর সাগর। এক্ষেত্রেও প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো বয়ে য়াওয়া জলকে আটকানো তবে অমর সাগর যাঁরা তৈরী করেছিলেন তাঁরা সম্ভবত এটাও জানাতে চেয়েছিলেন যে উপযোগী ও সুন্দর পুকুর তৈরী করার ইচ্ছা অমর। পাথরের টুকরো জুড়ে জুড়ে কতখানি 'বেজোড়' পুকুর হতে পারে অমর সাগর তার বিরল উদাহরণ। পুকুরের চওড়া একটা বাহু বেরিয়ে এসেছে খাড়া একটা দেওয়াল থেকে। দেওয়ালের সঙ্গে জোড়া সিঁড়ি, জানালা ও মিনার ছুঁয়ে তা নীচে নেমে গেছে। এই দেওয়ালের সমতল অংশে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতায় স্থাপিত হয়েছে পাথরের হাতি, ঘোড়া প্রভৃতি। পাথরের এই মূর্তিগুলি পুকুরের জলস্তরের সূচক। অমর সাগরের আগৌর এত বড় নয় যে তার থেকে সারা বছরের জল পাওয়া যাবে। গরম পড়তে না পড়তেই অমর সাগর শুকিয়ে আসে। তার মানে কি এই, যে জয়সলমেরের মানুষ এই সুন্দর পুকুরটিকে সেই সময়ই ভুলে যাবে, যখন সবথেকে বেশী জলের প্রয়োজন!

জয়সলমেরের শিল্পীরা অমর সাগরে এমন কিছু কাজ করেছেন যা শিল্প শাস্ত্রে কয়েকটা নতুন পাতা যোগ করেছে। এই পুকুরের তলায় সাতটা বেরি তৈরী করা হয়েছে। বেরি অর্থাৎ এক ধরণের বাউড়ি, একে পগ্‌বাও-ও বলা হয়। পগ্‌বাও শব্দ এসেছে পগ্‌বাহ থেকে। বাহ, বায় বা বাউড়ি। পগ্‌বাও অর্থাৎ পা-পা হেঁটেই যেখানে জল পর্যন্ত পৌঁছানো যায়। পুকুর শুকিয়ে যায় কিন্তু চোঁয়ানো জলে ভূগর্ভস্থ জলস্তর ওপরে উঠে আসে। এই পরিষ্কার ছাঁকা জলে বাউড়ি ভরে থাকে। বাউড়িগুলি এমন ভাবে করা হয়েছে যাতে গ্রীষ্মে জল হারিয়ে ফেলা অমর সাগর তার সৌন্দর্য না হারিয়ে ফেলে। সমস্ত বাউড়িগুলিতে পাথরের সুন্দর চাতাল, স্তম্ভ, ছত্র ও নীচে নামার জন্য শৈল্পীক সিঁড়ি। শুকনো অমর সাগরের সিঁড়িগুলি দেখতে লাগে মহলের একাংশের মতো। আর যখন ভরে ওঠে তখন মনে হয় পুকুরে ছাতাওয়ালা নৌকো ভাসছে। গ্রীষ্মের বৈশাখেও অমর সাগরে মেলা বসতো, আর বর্ষার ভাদ্রেও।

জয়সলমের মরুভূমির এমন একটা রাজ্য, বাণিজ্যে একসময় যার জয়ডঙ্কা বেজে ওঠে। তারপর মন্দার সময় এলো, কিন্তু জয়সলমের ও তার আশেপাশে পুকুর তৈরীতে মন্দা পড়েনি। গজরূপ সাগর, মূল সাগর, গঙ্গা সাগর, গোপাল পুকুর ও ইসরালজীর

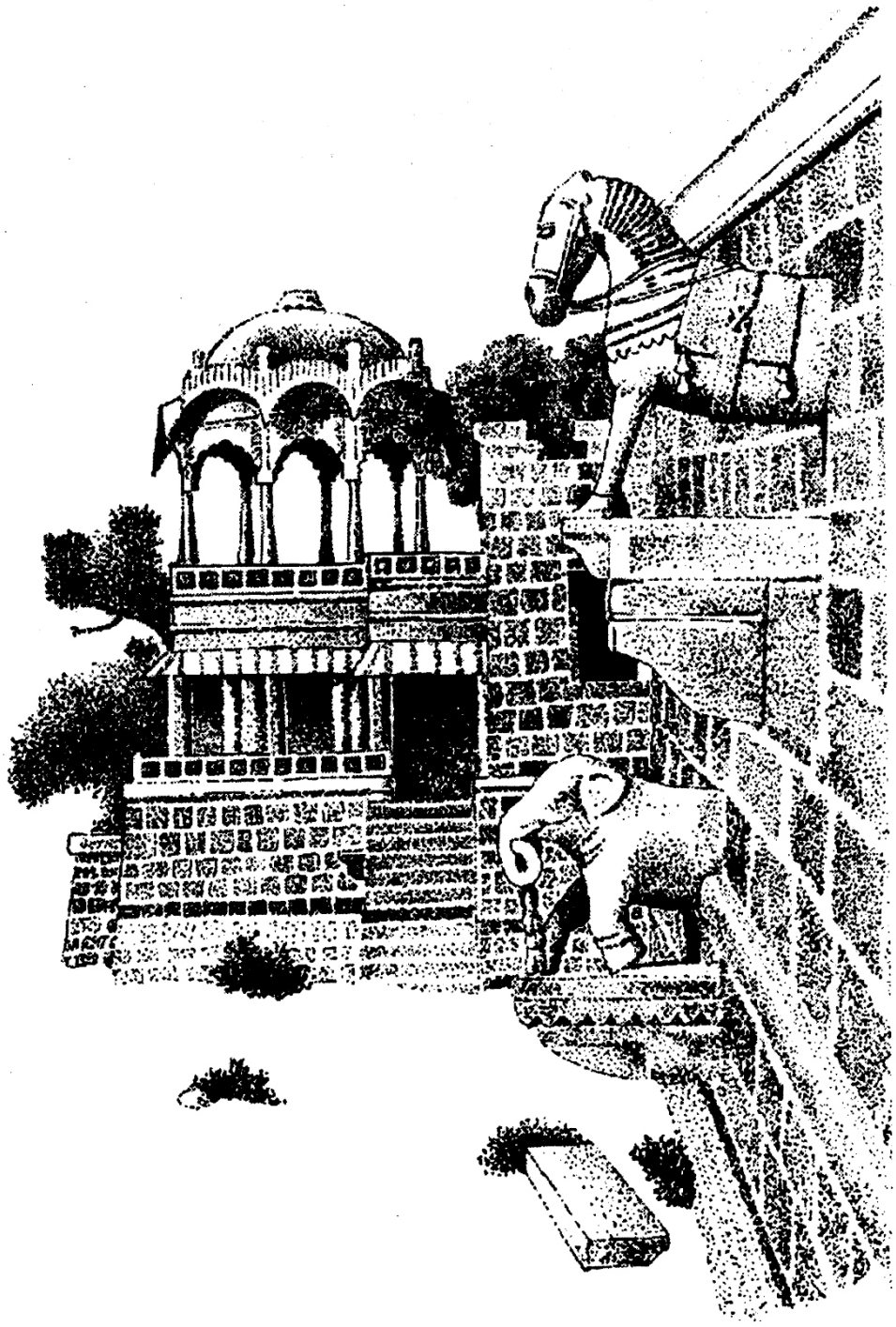

সুন্দর পুকুরের অমর ইচ্ছার 'অমর সাগর'

পুকুর - একের পর এক পুকুর তৈরী হয়েছে। ধারাটি ইংরেজ আসার আগে পর্যন্ত বজায় ছিলো। তবে এই ধারা, তার সুরক্ষা শুধুমাত্র রাজ, রাওল বা মহারাণাদের ওপরও ছেড়ে দেওয়া হয়নি। সমাজের সেই অংশ যাদের বর্তমান পরিভাষায় দুর্বল বলা হয়, তারাও সমানভাবে এই ঐতিহ্যপূর্ণ ধারাটিকে সুরক্ষিত রেখেছিলেন।

মেঘা পশু চরাতো: এই গল্প পাঁচশো বছরের পুরনো। পশুগুলো নিয়ে মেঘা

অমর সাগরে ভেসে বেড়ানো বেরিগুলি

ভোরবেলা বেরিয়ে পড়তো। মাইলের পর মাইল ছড়িয়ে থাকা মরুভূমি। সারাদিনের জন্য সে এক কোপড়ি (মাটির চ্যাপ্টা কুঁজো) জল সঙ্গে নিতো। ফিরতে ফিরতে সেই সন্ধ্যে। একদিন মেঘার অল্প একটুজল বেঁচে যায়। মেঘা কী জানি কী ভাবলো, একটা গর্ত খুঁড়ে জলটুকু সে তাতে ঢেলে দিয়ে ভালোভাবে আকন্দ পাতায় ঢেকে দিলো। চরানোর কাজ, আজ এখানে তো কাল অন্য কোথাও। মেঘা পরের দুদিন আর সেখানে যেতে পারলো না। তৃতীয় দিনে সেখানে পৌছে কৌতুহলের সঙ্গে পাতা সরালো। গর্তে জল অবশ্যই ছিলো না কিন্তু ঠাণ্ডা হাওয়া লাগলো চোখে মুখে। মেঘার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো - 'ভাপ'! মেঘা ভাবলো এখানে এই অল্প একটু জলের আর্দ্রতা যদি টিঁকে থাকে তাহলে এখানে পুকুরও হতে পারে।

মেঘা একাই পুকুর খুঁড়তে শুরু করে। এখন সে প্রতিদিন কোদাল, ঝড়া নিজের সঙ্গে করে নিয়ে যায়। দিনভর একাই মাটি কাটে পাড়ে এনে ফেলে। গরুগুলো আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। ভীমের মতো শক্তি তো তাঁর ছিলো না, তবে সঙ্কল্প ছিলো ভীষ্মের মতোই। দু বছর সে একাই কাজ করে যায়। সপাট মরুভূমিতে এখন পাড়ের ঘেরা দূর থেকেই দেখা যায়। ধীরে ধীরে পাড়ের খবর একদিন গ্রামেও এসে পৌছায়। এবার প্রতিদিন সকালে ছোট থেকে বড় অনেকেই মেঘার সঙ্গে কাজে যাওয়া আরম্ভ করে। সকলে মিলে কাজ করে। বারো বছর পুকুরের কাজ চলে। কিন্তু মেঘার জীবনকাল পূর্ণ হয়ে আসে। তাঁর স্ত্রী সতী হয়নি। এরপর মেঘার বদলে তাঁর স্ত্রী পুকুরের কাজে আসে। আরও ছ'মাস লাগে পুকুর তৈরী হতে।

ভাপ দেখে পুকুর তৈরী হয়েছিলো, তাই সে জায়গার নামও হয়ে যায় ভাপ। পরে যা বিকৃত হয়ে হয়ে যায় 'বাপ'। রাখাল মেঘাকে সমাজ মেঘাজী-র সম্মানে স্মরণে

রেখেছে এবং পুকুরের পাড়ে তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে সুন্দর এক ছত্র এবং তার স্ত্রীর স্মৃতিতে ওখানেই এক দেব মন্দির করা হয়েছে।

'বাপ' বিকানের, জয়সলমের রাস্তার ওপর ছোট্ট এক শহর। চা কচুরির ছ-সাতটা দোকানওয়ালা বাসস্ট্যাণ্ড এবং বাসের তিনগুন উচ্চতার পাড় স্ট্যাণ্ডের পাশেই দাঁড়িয়ে। মে-জুন মাসে পাড়ের এদিকে লু বয়, ওদিকে মেঘাজী পুকুরে ঢেউ ওঠে। বর্ষার দিনে পুকুরে লাখেটা (দ্বীপ) লাগানো হয়। তখন চার মাইল পর্যন্ত জল ছড়িয়ে পড়ে।

মেঘ ও মেঘরাজ যদিও মরুভূমিতে কম আসেন কিন্তু মেঘাজীর মতো লোকের অভাব কোনদিন হয়নি। জল সমস্যার সমাধানে এতখানি যোগ্য হয়ে ওঠা সমাজ, নিজের যোগ্যতা ও কৌশলকে কখনই নিজের বলে অহঙ্কার করে না। তাঁরা এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব নতমস্তকে ভগবানের কাছে সমর্পণ করেন। বলা হয়ে থাকে, মহাভারতের যুদ্ধ শেষ হলে কুরুক্ষেত্র থেকে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে দ্বারকায় ফিরছিলেন। তাঁদের রথ মরুপ্রদেশের ওপর দিয়ে চলছিলো। বর্তমান জয়সলমেরের কাছে ত্রিকূট পর্বতে তাঁরা উত্তুঙ্গ ঋষিকে তপস্যা করতে দেখেন। প্রনাম করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বর চাইতে বলেন। উত্তুঙ্গ অর্থাৎ উঁচু। সত্যিই ঋষি উঁচু মনের মানুষ ছিলেন। তিনি নিজের জন্য কিছুই চাইলেন না। প্রভূর কাছে প্রার্থনা করলেন - 'হে ভগবান, যদি আমার কিছুমাত্র পূণ্য থেকে থাকে, তাহলে বর দিন এই এলাকায় যেন কোন দিন জলের অভাব না থাকে'।

মরুভূমির সমাজ এই বরদান কে আদেশের মতো গ্রহণ করেন এবং নিজেদের দক্ষতা ও কৌশলে মরীচিকাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন।

১ভারতের প্রায় অর্ধেক জায়গায় (৪৯.২%) গড় বৃষ্টিপাত ৩০ইঞ্চির মতো (৭৬ সে মি)। ২৯.৬ শতাংশ এলাকায় এর পরিমাণ ৪৬ ইঞ্চির বেশী (প্রায় ১১৪ সে মি)। পরবর্তী এলাকার মধ্যে পড়ে পশ্চিমবঙ্গ। কাজেই বৃষ্টিপাতের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ অনান্য রাজ্যের তুলনায় ভালো অবস্থায় আছে। রাজ্যের যে দুটি জেলায় বৃষ্টিপাত সব থেকে কম (পুরুলিয়া ও মুর্শিদাবাদ) সেগুলিরও পরিমাণ ৫৩ থেকে ৫৪ ইঞ্চি। যা ভারতের অর্ধেক এলাকায় যে বৃষ্টিপাত হয় তার প্রায় দ্বিগুণই। কিন্তু বৃষ্টিপাতের পরিমাণই যে একমাত্র কথা নয় তা আমরা ফি বছরে খরা ঘোষিত হওয়া পুরুলিয়ার দিকে তাকালেই বুঝতে পারি। আর মুর্শিদাবাদের আর্সেনিক সমস্যার ভয়াবহতা নতুন করে বলার কিছু নেই বা এই পরিসরে তা বলা সম্ভবও নয়। (পরিসংখ্যানটি নেওয়া হয়েছে- পশ্চিমবঙ্গের জল সমস্যা : নাগরিক মঞ্চ : কলকাতা)

পুকুর বাঁধা ধর্মস্বভাব

সমাজকে যা জীবনদান করে তাকে নির্জীব বলে কী করে স্বীকার করা সম্ভব? পুকুর, জলস্রোত-ই জীবন আর মানুষ তো তার চারদিকেই নিজের জীবন রচনা করেছে। যার সঙ্গে সম্বন্ধ যত কাছের, যত স্নেহের, মন ততই তার নিত্য নতুন নাম রাখে। দেশের আলাদা আলাদা রাজ্যে, আলাদা আলাদা ভাষায়, চলিত কথায় পুকুরের অনেক নাম। চলিত কথার ভাণ্ডারে, ব্যাকরণে, পর্যায়ক্রমিক শব্দ তালিকাতে পুকুরের নামের এক ভর-ভরন্ত সংসার পাওয়া যায়। ডিঙ্গল ভাষার একটি ব্যাকরণ বই 'হমির নাম মালা'-তে পুকুরের পর্যায়ক্রমিক নাম তো রয়েইছে, সঙ্গে তার স্বভাবের বর্ণনা করতে গিয়ে 'ধর্মস্বভাব' কথাটি পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়েছে।

মানুষ ধর্মস্বভাবের সঙ্গে জুড়ে যায়, বাঁধা পড়ে যায়। প্রসঙ্গ যদি হয় সুখের, তাহলে পুকুর তৈরী হবে; প্রসঙ্গ যদি হয় দুঃখের তাহলেও পুকুর তৈরী হবে। জয়সলমের, বাড়মের-এর পরিবারগুলিতে সামর্থ কম থাকলে, নতুন পুকুর করার সুযোগ না থাকলে, সেই সীমিত সাধ্যে তাঁরা আগের তৈরী কোন পুকুরের পাড়ে মাটি দেওয়া, ছোটখাটো মেরামতি প্রভৃতি করাতেন। কোন পরিবারে মৃত্যু না আসে? কিন্তু প্রতিটি পরিবার নিজের দুঃখের প্রসঙ্গকে সমাজের সুখের জন্য পুকুরের সঙ্গে জুড়ে নিতেন।

পুরো সমাজের ওপরই দুঃখ এসেছে, দুর্ভিক্ষ এসেছে কিন্তু তবুও পুকুর তৈরী হয়েছে। মানুষের সাময়িক সাহায্য তো এতে হয়ই এবং জলের ব্যবস্থা হওয়ার ফলে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য দুঃখকে সহ্য করার শক্তিও সমাজে গড়ে ওঠে। বিহারের মধুবনী এলাকায় ছয়ের দশকে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় পুরো এলাকার সব গ্রামগুলি মিলে তেষট্টিটা পুকুর খুঁড়েছিলো!

এত বড় পরিকল্পনা, পরিকল্পিত হওয়ার থেকে কাজে পরিণত হওয়া পর্যন্ত না জানি কত সংগঠন তৈরী করতে হয়েছিলো - নতুন মানুষজন, নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্থাগুলি সেটা একবার ভেবেও তো দেখতে পারে। মধুবনীতে পুকুরগুলি এখনও আছে এবং মানুষজন সে কথা এখনও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করে।

কোথাও পুরস্কার স্বরূপ পুকুর করে দেওয়া হতো তো কোথাও পুকুর করার জন্য পুরস্কৃত করা হতো। গোণ্ড রাজাদের সীমায় যেই পুকুর করুক তাঁকে তার নীচের জমির খাজনা দিতে হতো না। এই প্রথা বিশেষভাবে দেখা যায় সম্বলপুর এলাকায়।

দণ্ডবিধানেও পুকুর পাওয়া যায়। বুন্দেলখণ্ডে জাতীয় পঞ্চায়েতে যখন নিজেদের কোন সদস্যকে ক্ষমাহীন অপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়া হতো, তখন সেই দণ্ডতে সাধারণত পুকুর কাটতে বলা হতো। এই ঐতিহ্য রাজস্থানেও আছে। আলোয়ার জেলার ছোট্ট একটা গ্রাম গোপালপুরা, সেখানে যাঁরা পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত মানেননি দণ্ডস্বরূপ তাদের কিছু কিছু পয়সা গ্রাম কোষাগারে জমা করতে হয়। পরে সেই পয়সা দিয়ে ছোট ছোট দুটো পুকুর কাটানো হয়।

পুঁতে রাখা সম্পত্তি কেউ পেলে নিজের জন্য নয়, ঐতিহ্য ছিলো পরোপকারে ব্যবহার করার। পরোপকার বলতে সাধারণভাবে মনে করা হতো পুকুর খোঁড়া বা পুরোনো পুকুরের সংস্কার করানো। বলা হয়, বুন্দেলখণ্ডের মহারাজা ছত্রসালের ছেলে জগৎরাজ মাটিতে পুঁতে রাখা সম্পত্তির এক তালিকা পেয়েছিলেন। তালিকার নির্দেশ

সমাজের সঙ্গে ঘাটেয়া বাবাও
পুকুরের পালনকর্তা

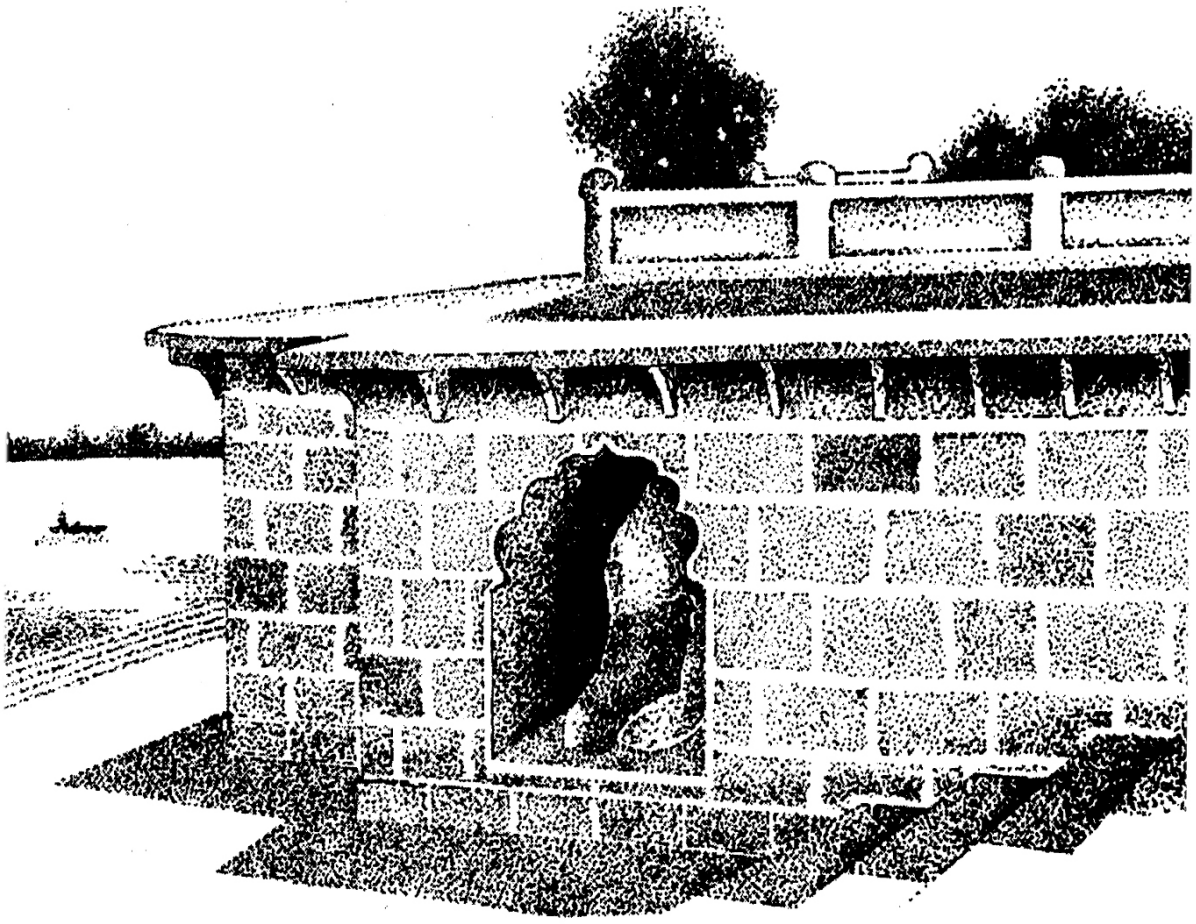

অনুসারে তিনি সে সম্পত্তি খুঁড়ে বার করেন। ছত্রসাল জানতে পেরে খুবই অসন্তুষ্ট হন। ছেলেকে বলেন -'মৃত চন্দেলকে কেন তুমি খুঁড়লে? কিন্তু সম্পত্তি খুঁড়ে যখন বার করা হয়েই গেছে তখন তা যেন ভালো কাজে ব্যবহার হয়।' তিনি পুত্রকে আদেশ দিলেন- 'চন্দেলের তৈরী সমস্ত পুকুরগুলি মেরামত করা হোক ও নতুন পুকুর তৈরী করা হোক।' সম্পত্তি ছিলো প্রচুর। পুরনো পুকুরগুলি মেরামত করা হলো এবং নতুন খোঁড়াও শুরু হলো। বংশ তালিকা দেখে বিক্রম সংবত ২৮৬ থেকে ১১৬২ পর্যন্ত

আজ সম্ভবত
তথাকথিত শিক্ষিত মানুষ
সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে
কিন্তু তখন বড় বিদ্যাকেন্দ্র থেকে
বেরিয়ে আসার মুহূর্তটি পুকুর তৈরীর প্রসঙ্গে বদলে যেতো।
মধুবনি, দ্বারভাঙ্গা এলাকায়
এই ঐতিহ্য প্রচলিত ছিলো বহুদিন।

বাইশ প্রজন্মের নামে বাইশটা বড় বড় পুকুর তৈরী করা হয়। বুন্দেলখণ্ডে গেলে আজও পুকুরগুলি দেখতে পাওয়া যাবে।

মাটিতে পোঁতা সম্পত্তি সকলে পায় না। কিন্তু সকলকে পুকুরের সঙ্গে যুক্ত করে দেখার জন্য কিছু দৃষ্টান্ত সমাজে রয়েছে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা এই দিন দুটিকে 'করাজ' অর্থাৎ ভালো এবং সর্ব্বজনীন কাজের দিন হিসেবে ঠিক করা হয়েছে। কৃষক এই দিন-দুটিতে নিজের ক্ষেতে কাজ করত না, সেই সময়টা সে দিতো নিজের এলাকার পুকুরের দেখাশোনা বা মেরামতিতে। সমাজে শ্রমও একটা পুঁজি। সেই পুঁজি লাগানো হতো সর্ব্বজনীন মঙ্গলে।

শ্রমের সঙ্গে পুঁজিরও ব্যবস্থা করা হয়েছে আলাদা করে। এই পুঁজির প্রয়োজন পড়বে শীতের পর পুকুরের জল কমে গেলে। তখন গ্রীষ্ম সামনে দাঁড়িয়ে, পুকুরে কোথায় ফাটল দেখা দিয়েছে, কোথায় ভেঙ্গে-টেঙ্গে গেছে তা দেখে নেওয়ার এটাই সবথেকে ভালো সময়। বছরের বারোটা পূর্ণিমা রাখা হয় শ্রমদানের জন্য কিন্তু পৌষের পূর্ণিমায় পুকুরগুলির তত্ত্বাবধান বা পুকুরের জন্য পয়সা জোগাড়ের চল রয়েছে। ছত্রিশগড়ে এই সময় পালিত হতো ছের-ছেরা উৎসব। ছের-ছেরা উৎসবে সকলে দলবেঁধে গান গাইতে-গাইতে ঘরে-ঘরে গিয়ে ধান জোগাড় করতো। সময়টাও ধান

ওঠার সময়। প্রতিটি পরিবার ধান দান করতো নিজের সামর্থ অনুযায়ী। এইভাবে জোগাড় করা ধান রাখা হতো গ্রামকোষে। এই কোষ থেকেই আগামী দিনে পুকুর ও অন্যান্য সর্ব্বজনীন ক্ষেত্রের মেরামতি এবং নতুন কাজও করা হবে।

সর্ব্বজনীন পুকুরে তো সকলের শ্রম ও অর্থের প্রয়োজন হতোই, ব্যক্তিগত পুকুরেও সর্ব্বজনিক স্পর্শ আবশ্যিক ছিলো। পুকুর খোঁড়া হয়ে গেলে সেই এলাকার সব সর্ব্বজনিক স্থান থেকে একটু একটু করে মাটি এনে পুকুরে ফেলার প্রচলন আজও পাওয়া যায়। ছত্রিশগড়ে পুকুর হলেই তাতে ঘোড়াশাল, হাতিশাল, বাজার, মন্দির, শ্মশান, বেশ্যালয়, আখড়া ও স্কুলের মাটি এনে ফেলা হতো।

আজ সম্ভবত তথাকথিত শিক্ষিত মানুষ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে কিন্তু তখন বড় বিদ্যাকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসার মুহূর্তটি পুকুর তৈরীর প্রসঙ্গে বদলে যেতো। মধুবনী, দ্বারভাঙ্গা এলাকায় এই ঐতিহ্য প্রচলিত ছিলো বহুদিন।

পুকুরেরও প্রাণ রয়েছে। তাই প্রাণ প্রতিষ্ঠা উৎসব পালিত হতো খুব ধুমধাম করে। পুকুরের নামকরণও হতো সেই দিনই। কোথাও কোথাও তাম্রফলক বা প্রস্তর ফলকে পুকুরের পুরো বিবরণ উৎকীর্ণ করা হতো।

সপ্ত মাতার মূর্তি

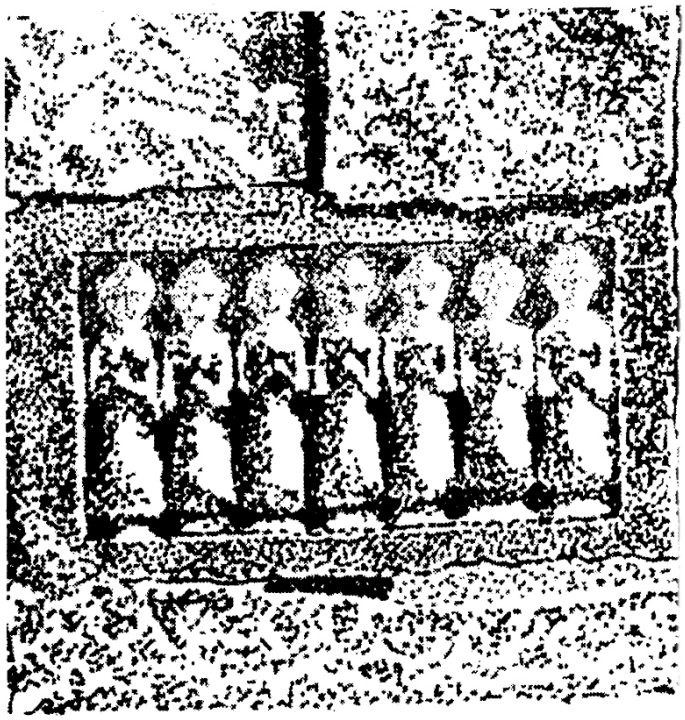

কোথাও কোথাও বিয়ের পুরো নিয়মানুসারে পুকুরের বিয়ে দেওয়া হতো। ছত্রিশগড়ে এই প্রথা আজও রয়েছে। বিয়ের আগে পুকুরের জল ব্যবহার করা যাবে না। বিয়েতে পুরো গ্রাম জমা হয়। আশপাশের মন্দির থেকে মাটি আসে। গঙ্গাজল আসে। গঙ্গাজলের সঙ্গে পাঁচটা বা সাতটা কুয়ো অথবা পুকুরের জল মিশিয়ে বিয়ে শেষ হয়। কখনো কখনো প্রস্তুত কারকেরা সামর্থ অনুযায়ী পণের ব্যবস্থা করেন।

পুকুরের বিয়ের[১] উৎসবের স্মৃতিতে পুকুরে স্তম্ভ বসানোর ঐতিহ্য তো রয়েইছে। কিন্তু পরে দ্বিতীয়বার যখন পুকুর পরিষ্কার বা খোঁড়া হতো সেই ঘটনার স্মরণেও স্তম্ভ লাগানোর ঐতিহ্য ছিলো।

বর্তমান পরিভাষায় বড় শহর পরিগণিত হয় জনসংখ্যার হিসেবে। অতীতে কিন্তু বড় গ্রাম বা শহরের পরিভাষায় পুকুর গোণা হতো। কত জনসংখ্যার গ্রাম বা শহর?

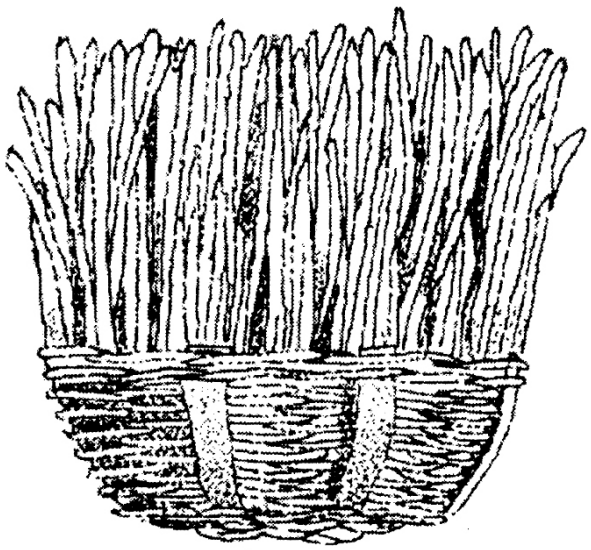

এ প্রশ্নের বদলে জিজ্ঞাসা করা হতো কত পুকুরের? ছত্রিশগড়ে প্রবাদে বড় গ্রামকে বলা হয়েছে 'ছৈ আগর ছৈ কোরি' অর্থাৎ ছয় কুড়ির থেকে ছয় বেশী, ১২০+৬ =১২৬ পুকুর হওয়া চাই। বর্তমান বিলাসপুর জেলার মালহার এলাকায় যে ঈসা অতীতে স্থাপিত হয়েছিলো, সেখানে পুরো একশো ছাব্বিশটি পুকুর ছিলো। ঐ এলাকারই রতনপুর (দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী), খরৌদি (সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী), রায়পুরের আরঙ্গ ও কুবরা এবং সরগুজা জেলার দীপডিপা প্রভৃতি গ্রামে আজও, এই আটশো হাজার বছর পরেও কোথাও বা একশো আবার কোথাও পুরো একশো কুড়িটি পুকুর গোণা যেতে পারে।

এই পুকুরগুলির দীর্ঘ জীবনের রহস্য ছিলো একটাই - মানুষের ভালবাসা বা মমত্ব। এ শব্দটা আমার দেওয়া। এইসব দৃষ্টান্তের পর রক্ষণাবেক্ষণের মতো শব্দ বড় ছোট লাগে। 'ভূজলিয়ার আট অঙ্গ যেন জলে ডোবে'- এ গান গাইতে পারেন, এ কামনা[২] করতে পারেন - এমন স্ত্রীলোকেরাও ছিলেন। আর এরকম স্ত্রীলোকেরা যদি থাকেন তাহলে তার পিছনে সেরকম সমাজও ছিলো, যাঁরা এই কামনাকে পূরণ করার মতো পরিবেশ তৈরী করাকে নিজেদের কর্তব্য বলে মনে করতেন। ঘরগৈল, ঘরমৈল অর্থাৎ সব ঘরের মিলনেই পুকুরের কাজ হতো।

সকলের মিলনেই তীর্থ। যিনি তীর্থে যেতে পারেননি তিনি নিজের এলাকাতে পুকুর করিয়ে পুণ্য অর্জন করতে পারেন। যিনি পুকুর তৈরী করেন তিনি পুণ্যাত্মা। আর যাঁরা পুকুর বাঁচিয়ে রাখেন তাঁরাও সমান সম্মানের অধিকারী। এইভাবে পুকুর এক তীর্থ। এখানে মেলা বসে। আর এই মেলায় জমা হওয়া সমাজ পুকুরকে নিজেদের নয়নে ও হৃদয়ে জায়গা দিয়েছেন।

পুকুর সমাজের মনে রয়েছে। আবার কোথাও কোথাও শরীরেও। অনেক বনবাসী মানুষই পুকুর, বাউড়ির উল্কি করান। সহরিয়া সমাজ উল্কিতে পশু, পাখি, ফুল, মাছ... ইত্যাদির সঙ্গে সীতা বাউড়ি বা সাধারণ বাউড়িও করান। সহরিয়া নিজের শরীরকে পূর্বপুরুষ মনে করে, সীতাজীর সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলে ভাবে। তাই সহরিয়া খুব গর্বের সঙ্গে সীতা বাউড়ি উল্কিতে আঁকায়।

সীতা বাউড়ির বিশালতা প্রাধান্য পেয়েছে। ভেতরে ঢেউ। মাঝখানে একটি ছোট্ট বিন্দু যা জীবনের প্রতীক। বিস্তারের বাইরে সিঁড়ি এবং চার কোনায় ফুল। ফুলে জীবনের সুবাস। এত কথা এক সহজ-সরল রেখাচিত্রে ফুটিয়ে তোলা খুব একটা সহজ নয়। কিন্তু যাঁরা উল্কি করেন সেই শিল্পীগণ এবং উল্কি করাতে চান যে নারী-পুরুষ তাঁদের সকলেরই হৃদয় - পুকুর, বাউড়িতে এতই বিহ্বল যে আট-দশটা রেখা, কয়েকটা ফুটকি শরীরে পুরো দৃশ্যটিকে সহজেই ফুটিয়ে তোলে। এই প্রথা তামিলনাড়ুর দক্ষিনে আরকাট জেলার কুঁরাও সমাজেও রয়েছে।

যাঁদের মনে পুকুর, শরীরে পুকুর, তাঁরা পুকুরকে শুধু একটা জলভরা গর্ত মনে করতে পারে না। তাঁদের কাছে পুকুর এক জীবন্ত ঐতিহ্য, পরিবার ও অনেক সম্বন্ধ-সম্বন্ধী। কোন সময় কাকে স্মরণ করতে হয় সে সম্পর্কেও তাঁদের পূর্ণ চেতনা আছে। যেমন, যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে কতদূর প্রার্থনা পৌঁছাতে হবে? ইন্দ্র হলেন বৃষ্টির দেবতা, কিন্তু সরাসরি তাঁকে ডাকা কঠিন, সম্ভবত ঠিকও নয়। তাঁর মেয়ে কাজল। কাজল মায়ের কাছ পর্যন্ত প্রার্থনা পৌঁছালে তিনি ভালভাবে পিতার নজর এদিকে টানতে পারবেন। বীজ ফেলার পক্ষকালের মধ্যে বৃষ্টি না হলে কাজল মায়ের পূজা হবে। গোটা গ্রাম কাঁকড়বনি অর্থাৎ গ্রাম সীমার জঙ্গলে যে পুকুর, গান গাইতে গাইতে সেখানে জড়ো হবে। তারপর দক্ষিণ দিকে মুখ করে সকলে প্রার্থনা জানাবে[৩]। দক্ষিণ থেকেই তো জল আসে।

সীতা বাউড়ি

কোন পুকুরই একা নয়।
সে ভরভরন্ত জলপরিবারের এক সদস্য।
তাতে সকলের জল মিশে আছে ও
তার জল মিশে আছে সকলের মধ্যে
এই কথা যাঁরা মনে করেন তাঁরা
সত্য সত্যই এরকমই এক পুকুর তৈরী করে
দেখিয়ে দিয়েছিলেন। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের
কাছে 'বিন্দু সাগর'। সমস্ত দেশের সমস্ত প্রবাহ,
সমস্ত নদী, এমনকী সাগরের জল
পর্যন্ত এখানে মিলিত হয়েছে।
দূর দূরান্ত থেকে পুরীতে আসেন যেসকল ভক্ত,
তাঁরা নিজেদের এলাকার একটুখানি জল সঙ্গে
করে নিয়ে এসে বিন্দু সাগরে অর্ঘ্য দেন

পুকুর কানায় কানায় ভরে ওঠাও এক উৎসব। অপরা বইতে শুরু করেছে- সমাজের কাছে এর থেকে বড় আর কোন প্রসঙ্গ হতে পারে! ভুজ (কচ্ছ)-এর সবথেকে বড় পুকুর হমিরসর-এর ঘাটে হাতির এক মূর্তি অপরা বইতে শুরু করার সূচক। জল এই মূর্তি স্পর্শ করলেই খবর ছড়িয়ে পড়ত। শহর এসে উপস্থিত হতো ঘাটে। কম বৃষ্টিপাতের এই এলাকা দিনটিকে উৎসবে স্মরণীয় করে তুলতো। ভুজের রাজা ঘাটে আসতেন ও সকলের উপস্থিতিতে পুকুরের পূজো করে ভরা পুকুরের আশির্বাদ নিয়ে ঘরে ফিরতেন। টলটলে ভরে ওঠা পুকুর শুধুই একটা ঘটনা নয়, আনন্দ ও মঙ্গলের সূচক। উৎসব, মহোৎসব রাজা-প্রজাকে ঘাট পর্যন্ত নিয়ে আসে।

এই দিনগুলিতে দেবতারাও ঘাটে আসেন। জলঝুলন উৎসবে মন্দিরগুলির চলমূর্তি[৪] পুকুর পর্যন্ত আনা হয় এবং পূর্ণ শৃঙ্গারের সঙ্গে তাঁদের দোলনায় দোলানো হয়। ভগবানও শ্রাবনের ঝুলনে দোলার আনন্দ উপভোগ করেন।

কোন পুকুরই একা নয়। সে ভরভরন্ত জল পরিবারের এক সদস্য। তাতে সকলের জল মিশে আছে ও তার জল মিশে আছে সকলের মধ্যে। এই কথা যাঁরা মনে করেন তাঁরা সত্য সত্যই এরকমই এক পুকুর তৈরী করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের কাছে বিন্দু সাগর। সমস্ত দেশের সমস্ত প্রবাহ, সমস্ত নদী এমনকী সাগরের জল পর্যন্ত এখানে মিলিত হয়েছে। দূর দূরান্ত থেকে পুরীতে আসেন যে সকল ভক্ত, তাঁরা নিজের এলাকার একটুখানি জল সঙ্গে করে নিয়ে এসে বিন্দু সাগরে অর্ঘ্য দেন।

এই মুহূর্তে যখন দেশের একতা প্রশ্নচিহ্নের মুখে তখন বিন্দু সাগরকে রাষ্ট্রীয় একতার সাগর বলা যেতে পারে। বিন্দু সাগর যেন অখণ্ড ভারতের প্রতীক।

ভবিষ্যৎকাল কেমন হবে? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সব সময়ই শক্ত। কিন্তু এরও একটা মানদণ্ড ছিলো — 'পুকুর'। নবরাত্রের পর অঙ্কুরিত যব বিসর্জন দেওয়া হয় পুকুরে। এই সময় রাজস্থানের মানুষ জড়ো হতেন পুকুরে। ভোপা অর্থাৎ পুরুত ঠাকুর যব বিসর্জনের পর পুকুরের জলস্তর দেখে আগত দিনের ভবিষ্যদ্বাণী করতেন। বর্ষা ততদিনে পেরিয়ে গেছে; পুকুরে যতটা জল আসার কথা, এসে গেছে। এখন এই পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করছে আগামী দিনের পরিস্থিতি।

আজকাল এই প্রথা প্রায় উঠেই গেছে। পুকুরের জলস্তর দেখে ভবিষ্যদ্ববাণী করতে হলে আজ অনেক পুকুরের পাড়ে দাঁড়ানো ভোপাই বলবেন - 'সময় খারাপ আসছে'।

১।পশ্চিমবাংলাতেও পুকুরের বিয়ে এখনও প্রচলিত রযেছে। যে পুকুরের মাঝে শাল কাঠের স্তম্ভ বা ছোট্ট মতো মন্দির দেখতে পাওয়া যায়, বুঝতে হবে সে পুকুরের বিয়ে হয়েছে। পুকুর প্রতিষ্ঠারও প্রচলন রয়েছে এবং প্রতিষ্ঠাতেও স্তম্ভ লাগানো হয়; তবে এ ক্ষেত্রে সাধারণত বেল কাঠ ব্যবহার করা হয়।

২। বাংলা ও বিহারের উৎসব - জিতাষ্টমী বা জিতিয়া। এই উৎসবের শেষে মেয়েরা পুকুর বা নদীর জলের তলায় দাঁড়িয়ে শসা জাতীয় ফল খেয়ে ব্রত বা উপবাস ভঙ্গ করেন। এই উৎসব হয় আশ্বিন মাসে। অর্থাৎ পকুরের আগর তখন জলরাশিতে পরিপূর্ণ। এই উৎসবের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, এই সমাজের মহিলারা শুধু তাদের আট অঙ্গ ডোবার কামনাতেই তাদের ব্রত শেষ করতে চাননি, একেবারে ডুবে পরখ করে নিতে চেয়েছেন। লোককথা বলছে পুত্র লাভের কামনায় মহিলারা করেন এই ব্রত। আশ্বিনের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে সন্ধ্যায় ঘরের উঠোনে পুকুর কেটে শালিবাহনপুত্র জীমূতবাহনের পুজা করেন। লোককথা যাই বলুক, জীমূত মানে মেঘ; আর জীমূতবাহন অর্থাৎ মেঘযান - ইন্দ্র। তাই পুকুরের সঙ্গে, জলের সঙ্গে এই ব্রতের গভীর সম্পর্ক অস্বীকার করা যায় না।

৩। বৃষ্টি হওয়া না হওয়ার অপেক্ষা না করেই বাংলায় জৈষ্ঠ্যের দুপুরে ঘরে ঘরে পালিত হতো পূণ্যিপুকুর ব্রত। এখন আর বাংলার মেয়েদের পুণ্যিপুকুর ব্রত করতে দেখা যায় না।

৪। মন্দির থেকে যে বিগ্রহ বাইরে আনা যায় তা হলো চল মূর্তি।

আজও পুকুরগুলি খাঁটি

সময়টা খারাপ ছিলো।

ভোপা থাকলে নিশ্চিত বলতো সময়টা খারাপ। যে সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও বিশ্বাস পুকুর তৈরী করত তা ক্রমে শুকিয়ে যেতে আরম্ভ করে।

'দূরত্ব' একটা ছোট্ট শব্দ, কিন্তু এই ছোট শব্দটা প্রশাসন ও সমাজের মাঝে এসে পড়লে সমাজের কষ্ট যে কী পরিমাণ বেড়ে যায় তার হিসেব করা যায় না! আর এই দূরত্ব যদি এক পুকুরের বদলে হয় সাত সমুদ্রের , তখন আর ব্যাখ্যা করার বাকি কী থাকে?

ইংরাজ আসে সাত সমুদ্র পার করে। সঙ্গে নিয়ে আসে নিজের সমাজের সংস্কৃতি ও অনুভূতি। ইংল্যান্ডে ছিলো প্রভু-দাসের সম্পর্ক। সমাজের হিত কিসে তা ওখানকার প্রশাসনই সিদ্ধান্ত নিত। এখানে ছিলো জাতির সমাজ। রাজা অবশ্যই ছিলেন কিন্তু রাজা-প্রজার সম্বন্ধ ছিলো ইংরাজের অনুভব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানকার মানুষ নিজের হিত নিজে স্থির করতেন ও তা পূর্ণ করতেন নিজেদের শক্তিতে ও সহযোগিতায়। রাজা ছিলেন সহায়ক মাত্র।

আমাদের সমাজের কর্তব্যবোধের বিশাল সাগরের একটি বিন্দু হলো জলের ব্যবস্থা ও তার চিন্তা। সাগর ও বিন্দু একে অপরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে ছিলো। বিন্দু যদি সাগর থেকে আলাদা হয়ে যায় তাহলে না থাকে সাগর না বাঁচে বিন্দু। সাত সমুদ্র পেরিয়ে আসা ইংরাজ সমাজের না ছিলো কর্তব্যবোধের সাগর না তার বিন্দু। তারা নিজেদের দেশের অনুভব ও প্রশিক্ষণ অবলম্বনে দলিল দস্তাবেজ খোঁজার চেষ্টা করে। কিন্তু সেরকম কোন রেকর্ড তো আমাদের রাজ্যে রাখা হতো না। তাই তারা ঠিক করলো এখানে যা করার তাদেরই করতে হবে। এখানে তো কিছুই নেই!

দেশের অনেকাংশে ঘুরে ঘুরে ইংরেজরা অনেক খোঁজ-খবর জোগাড় করেছিলো, তবে তা তাদের কৌতূহলের বেশী কিছু ছিলো না। তাদের চোখে কর্তব্যের সাগর বা তার বিন্দুকে বোঝার দৃষ্টিটাই ছিলো না। তাই প্রচুর পরিমাণ খোঁজ-খবর যোগাড় করার পরও যে নীতি তৈরী হলো, তা সাগর ও বিন্দুকে তাদের অচ্ছেদ্য বন্ধন থেকে আলাদাই করলো।

যদিও উৎকর্ষের সময় পার হয়ে গেছিলো তবুও কিন্তু পতন শুরু হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এমনকী বিংশ শতাব্দীর শুরুতেও ইংরাজরা যা কিছু দেখেছিলো, যা কিছু লিখেছিলো এবং যে গেজেটিয়ার তৈরী করেছিলো তাতে অনেক জায়গায় শুধু ছোটই নয় বড় বড় পুকুরেও কাজ চলার উল্লেখ পাওয়া যায়।

মধ্যপ্রদেশের দুর্গ ও রাজনাঁদ গ্রামের মতো জায়গায় ১৯০৭ সাল পর্যন্ত অনেক বড় বড় পুকুর তৈরী হচ্ছিলো। বাঁদুলা নামের একটি পুকুরে বারো বছর কাজ চলার পর সেই সালেই সেটি শেষ হয়। এই পুকুর থেকে সেচের জন্য যে নহরগুলি বা নালাগুলি কাটা হয় সেগুলির দৈর্ঘ্য ছিলো পাঁচশো তেরো মাইল।

সমাজকে টিকিয়ে রাখার জন্য এই সমস্ত কাজ করতেন যে নায়করা, তাঁরা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক কোন পরিকল্পনা কেমন করেই বা মেনে নিতেন? তাঁরা ইংরেজদের চ্যালেঞ্জ জানান। এই দ্বন্দ্বের কারণেই সাঁসি, ভীলদের মতো আত্মাভিমানী জাতিগুলি ইংরেজদের কাছে ঠগ্, অপরাধপ্রবন প্রভৃতি অপবাদ পায়। আগের যা কিছু তা ইংরাজরা ভেঙ্গে ফেলতে চেয়েছিলো। কেননা, এবার তো যা কিছু করার তারাই করবে! তবে এই যে আগের পরিকাঠামোগুলোকে নস্যাৎ করা বা উপেক্ষা করা, এটা তাদের কোন পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিলো না। এটা ছিলো তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর সহজ পরিণাম। আর দুর্ভাগ্যক্রমে এই দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের সমাজের সেই মানুষগুলির মধ্যেও সংক্রামিত হয়ে পড়লো যাঁরা মনপ্রান দিয়ে ইংরাজদের বিরোধিতা করেন, স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ পর্যন্ত করেন।

বিগত দিনের অভ্যস্থ হাতগুলিকে বদলে দেওয়া হলো অকুশল কারিগরে। এমন বহু মানুষ যাঁরা গুনিজনখানা, অর্থাৎ গুণী বলে আখ্যা পেয়েছিলেন তাঁরা এখন অশিক্ষিত, অসভ্য, অ-প্রশিক্ষিত আখ্যা পেলেন। এই নতুন রাজ-ও তার প্রকাশে উজ্জ্বল নতুন সামাজিক সংস্থাগুলি নতুন আন্দোলন ও নিজেদের নায়কদের শিক্ষণে প্রশিক্ষণে ইংরাজদের থেকেও এগিয়ে গেলো! স্বাধীনতার পরের সরকার ও সামাজিক সংস্থাগুলির আচরণ, বিশেষ করে আন্দোলনের এই লজ্জাজনক প্রবৃত্তি যথারীতি বহাল থাকে।

সেই গুণীসমাজের হাত থেকে কিভাবে জলের ব্যবস্থা কেড়ে নেওয়া হয় তার

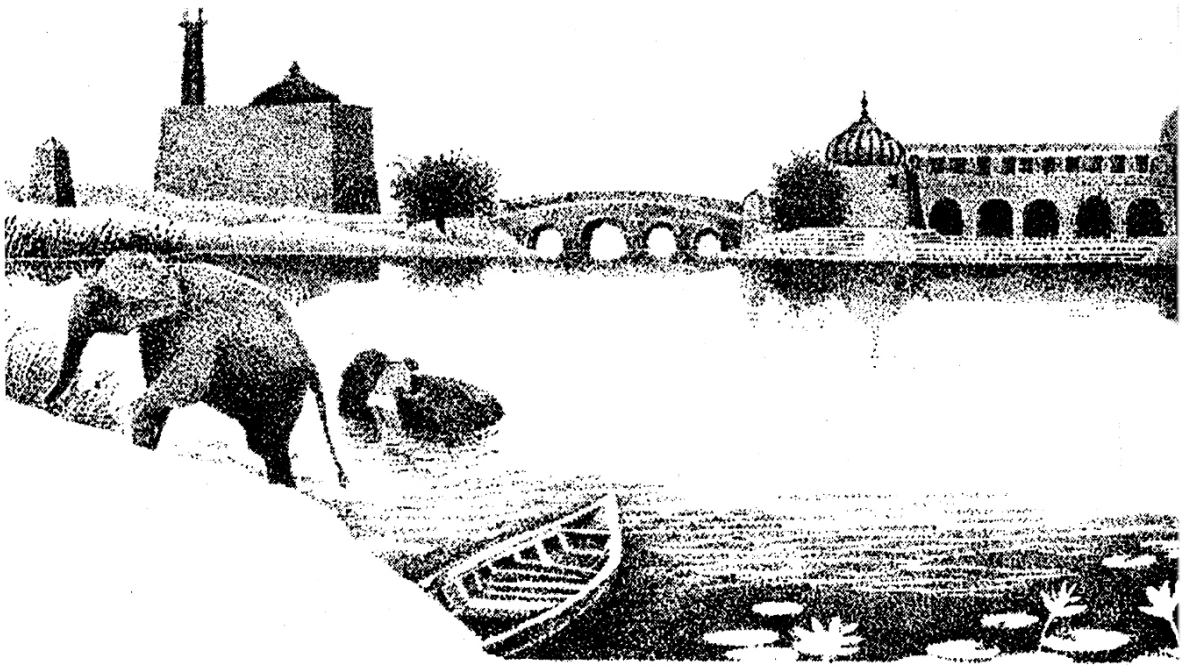

আজও খাঁটি,
দিল্লীর হোজ এ শাম্স

একটি নমুনা দেখা যায় ঐ সময়ের মহীশূর রাজ্যে।

১৮০০ সালে মহীশূর রাজ দিওয়ান পূণৈয়া দেখতেন। তখন রাজ্য জুড়ে উনচল্লিশ হাজার পুকুর ছিলো। বলা হতো, সেখানকার কোন পাহাড়ে এক ফোঁটা বৃষ্টির অর্ধেক এদিকে ও অর্ধেক ওদিকে গড়িয়ে পড়লে দুই দিকেই সামলে রাখার পুকুর ছিলো। সমাজ তো ছিলোই তাছাড়াও এই উন্নতমানের পুকুরগুলির দেখাশোনায় রাজাও খরচ করতেন লক্ষ লক্ষ টাকা।

রাজা গেলো, ইংরাজ এলো। সব থেকে আগে তারা বন্ধ করলো এই খরচ। কেননা তাদের মতে এই খরচটা ছিলো বাজে খরচ। রাজত্বের দিক থেকে পুকুরের জন্য যে খরচ দেওয়া হতো, ১৮৩১ সাল থেকে তা কেটে অর্ধেক করে দেওয়া হলো। রাজত্বের এই কৃপণতাকে সমাজ নিজের উদারতা দিয়ে পরবর্ত্তী বত্রিশ বছর ঢেকে রাখে। পুকুর সাধারণ মানুষেরই ছিলো তাই রাজ বা সরকার থেকে পাওয়া সাহায্য কমে যাওয়া বা কোথাও কোথও বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও সমাজ পুকুরগুলি সামলে রাখে। অত দীর্ঘ বছরের স্মৃতি অত তাড়াতাড়ি অত সহজে হারিয়ে যাওয়ার নয়! কিন্তু বত্রিশ বছর পর অর্থাৎ ১৮৩১ সালে সেখানে প্রথম পি ডব্লু ডি আসে তখন সমস্ত পুকুর মানুষের হাত থেকে এই সংস্থার হাতে সঁপে দেওয়া হয়।

প্রতিষ্ঠা তো প্রথমেই কেড়ে নেওয়া হয়েছিলো। ধনসম্পদও কেড়ে নেওয়া হলো। এবারে প্রভুত্বও গেলো। সম্মান, অধিকার ও সুবিধা হারিয়ে সমাজ দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলো। এই অবস্থায় শুধু নিজেদের কর্তব্য করে যাবে এ আশাই বা তাদের কাছে কি

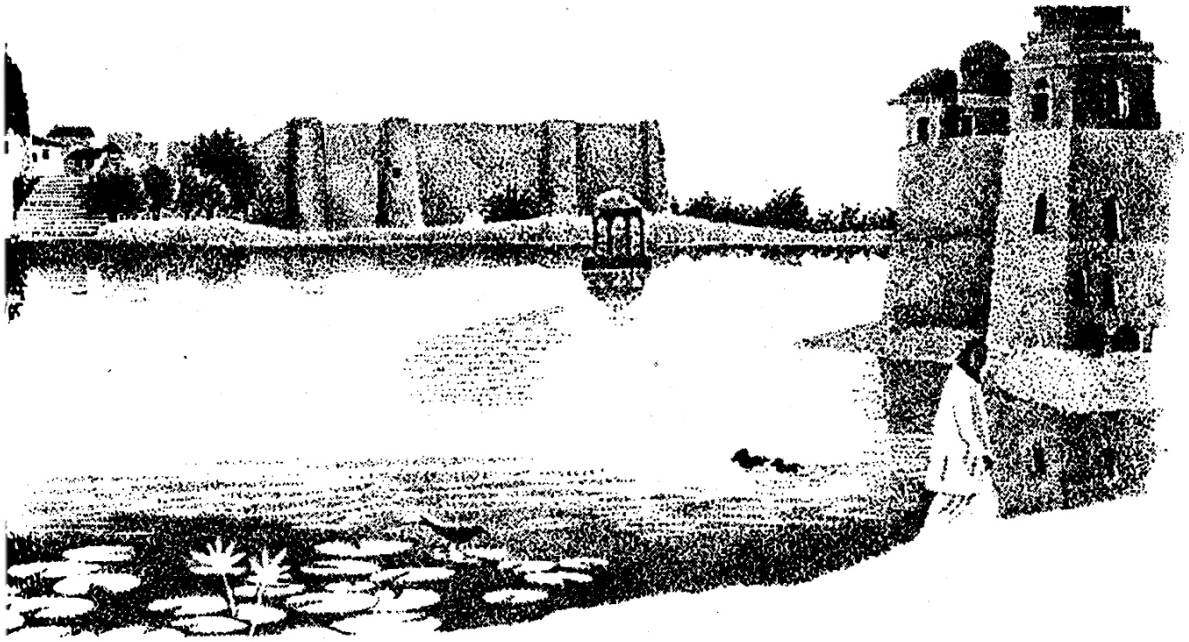

করে করা যায়?

মহীশূরের ৩৯,০০০ পুকুরের দুর্দশার কাহিনী খুবই লম্বা। পি ডব্লু ডি দিয়ে যখন কাজ চলল না, তখনই প্রথম সেচ-দপ্তর তৈরী হলো। পুকুরগুলি এবার সেচ-দপ্তরকে দেওয়া হলো। তাদের দ্বারাও কিছু না হলে আবার পি ডব্লু ডি কে। এদিকে এই পাল্টা-পাল্টির মাঝে পুকুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খরচ কমতে লাগলো অথচ পুকুরের রাজস্ব বাড়তে লাগলো। ইংরাজ এই কাজের জন্য চাঁদা পর্যন্ত আদায় করা আরম্ভ করলো, পরে যা পশু মাসুল পর্যন্ত পৌঁছেছিলো।

এদিকে দিল্লী, পুকুরের দুর্দশার এক নতুন রাজধানী তৈরী হতে চলেছিলো। ইংরাজ আশার আগে পর্যন্ত এখানে পুকুরের সংখ্যা ছিলো তিনশো চল্লিশ। এগুলিকেও রাজ্যের লাভ ক্ষতির পাল্লায় মাপা হলো এবং যেগুলি থেকে রোজগার হবে না বলে মনে করা হলো সেগুলিকে ছুঁড়ে ফেলা হলো রাজ্যের বিবেচনার বাইরে।

সেই সময়ই দিল্লীতে পাইপ লাইন বসানো চলছিল। ১৯০০ সালের আশেপাশে, বিয়ের সময় গাওয়া 'গারিয়ো' গানে, এর বিরুদ্ধে ক্ষীণ সুরেলা আওয়াজ শোনা যায়। বরযাত্রী পংক্তিতে বসলে মেয়েরা গেয়ে উঠতো 'ফিরিঙ্গি নল বসাতে দিও না'। কিন্তু নল বসানো হতে থাকে এবং কুয়ো, পুকুর, বাউড়ির বদলে জল আসতে লাগলো ইংরাজদের তৈরী ওয়াটার ওয়ার্কস থেকে।

প্রথমে বড়, পরে ছোট শহরগুলিতেও এই স্বপ্নকে আকার দেওয়া হতে থাকে। কিন্তু শুধু পাইপ বসিয়ে পাইপে মুখ লাগিয়ে দিলেই তো জল পাওয়া যাবে না! এই

কথা তক্ষুনি না হলেও স্বাধীনতার কিছু সময় পর থেকেই আস্তে আস্তে বোঝা যাচ্ছিলো। ১৯৭০ সালের পর তা পাল্টে যেতে লাগলো ভয়ার্ত দুঃস্বপ্নে। ততদিনে অনেক পুকুরই অবহেলা, উপেক্ষার পলিতে ভরাট হয়ে গেছে। তার ওপর গড়ে উঠেছে নতুন পাড়া, স্টেডিয়াম অথবা বাজার।

জল কিন্তু নিজের রাস্তা ভোলে না। পুকুর বুজিয়ে যে নতুন পাড়া গড়ে উঠলো বর্ষার সময় তা জলে ভরে যায় আবার বর্ষা শেষ হয়ে শীত পড়তে না পড়তেই ঘন হতে থাকে জলসঙ্কটের মেঘ। যে শহরের এখনও কিছু পয়সা আছে, শক্তি আছে সে অন্যের জল কেড়ে নিয়ে নিজের পাইপগুলো কোনভাবে সচল রেখেছে। কিন্তু অন্যগুলির অবস্থা প্রতি বছর খারাপের দিকেই চলেছে। অনেক শহরের কালেক্টর ফেব্রুয়ারীর আশেপাশেই গ্রামের পুকুরগুলির জলে সেচের কাজ বন্ধ করে তা সুরক্ষিত রাখেন শহরের জন্য।

শহরের জল চাই, কিন্তু জল প্রদানকারী পুকুর নয়। টিউবওয়েল থেকেই তা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তার জন্য বিদ্যুৎ, ডিজেলের সঙ্গে সঙ্গে সেই শহরের মাটির তলায় জলওতো থাকা চাই। চেন্নাই-এর মতো অনেক শহরের দুঃখজনক পরিস্থিতি এই কথাই বলে যে ক্রমাগত নেমে যেতে থাকা জলস্তর শুধু তত্ত্ব বা পয়সার জোরে ঠেকানো যাবে না। কিছু শহর দূর নদী থেকে জল বয়ে আনার ভীষণই খরচসাপেক্ষ ও অব্যবহারিক ব্যবস্থা করেছে। ফলে এই পৌরসভাগুলির ওপর কোটি টাকার ইলেকট্রিক বিল চেপে বসেছে।

ইন্দোরের এইরকম উদাহরণ আমাদের চোখ খুলে দিতে পারে। দূরে প্রবাহিত নর্মদার জল এখানে বয়ে আনা হয়। পরিকল্পনার প্রথম ধাপ পর্যাপ্ত না হলে দ্বিতীয় ধাপের জন্য দাবী ওঠে সমস্বরে এবং ১৯৯৩ সালে তৃতীয় ধাপের জন্য আন্দোলনও শুরু হয়। এতে জনতা পার্টি, সাম্যবাদী দল ছাড়াও শহরের পালোয়ান শ্রী আনোখীলাল- ও চৌত্রিশ দিন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সত্যাগ্রহ করেন। কিন্তু এই ইন্দোরেই কিছুদিন আগে বিলাওলির মতো পুকুর ছিলো। যাতে ফ্লাইং ক্লাবের বিমান ডুবে যাওয়ায় নৌসেনা নামাতে হয়েছিলো! নৌসেনাও বড় সহজে কাজটি করে উঠতে পারেনি। আজ বিলাওলি একটা প্রকাণ্ড শুকনো মাঠ। ফ্লাইং ক্লাবের বিমান এখান থেকে সহজেই ওড়ানো যাবে।

ইন্দোরের পড়শি শহর 'দেওয়াস'-এর গল্প আরও বিচিত্র। গত ত্রিশ বছরে এখানে ছোট বড় সমস্ত পুকুর বুজিয়ে ফেলা হয়। এরপর সেই জায়গায় বড় বড় বাড়ি,

*এখন তো **বিলাওলি***
পুকুরে বিমান ওড়ানো যাবে।

কারখানা উঠে গেলো। এবার জানা গেলো শহরকে জল দেওয়ার মতো কোন জলের উৎস আর সেখানে বেঁচে নেই। শহর খালি হওয়া পর্যন্ত খবর ছাপা হচ্ছিলো। শহরের জল প্রয়োজন কিন্তু জল আনা হবে কোথা থেকে? কুয়ো, পুকুরের বদলে দেওয়াস স্টেশনে দিবা রাত্রি কাজ চললো দশ দিন। ২৫ এপ্রিল ১৯৯০ সালে ইন্দোর থেকে পঞ্চাশ ট্যাঙ্কার জল নিয়ে একটি ট্রেন দেওয়াস স্টেশনে এসে থামলো। মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ঢোল-নাকড়া বাজিয়ে জলের গাড়ির অভ্যর্থনাও হলো। মন্ত্রীমশায় নর্মদার জল পান করে প্রকল্পের উদ্‌ঘাটন করলেন। এর আগেও শঙ্কটের সময় গুজরাট, তামিলনাড়ুতে রেলে করে জল পৌঁছানো হয়েছে। কিন্তু দেওয়াসে এখন প্রতিদিন রেলে জল আসে সেই জল পাম্প করে ট্যাঙ্কে তোলা হয়, তারপর শহরে দেওয়া হয়।

রেলের ভাড়া প্রতিদিন চল্লিশ হাজার টাকা! বিদ্যুতের সাহায্যে ওপরে জল তোলার খরচ আলাদা, আর ইন্দোর থেকে যে জল পাওয়া যায় তার দাম ধরলে দুধের দাম ও জলের দামে কোন তফাৎ থাকবে না। কেন্দ্র থেকে রেলভাড়া আপাতত মকুব করে দেওয়া হচ্ছে। দিল্লীর জন্য সুদূর গঙ্গা থেকে জল তুলে আনা কেন্দ্র এখনও মধ্যপ্রদেশের প্রতি উদারতা বর্ষণ করে চলেছে, কিন্তু নতুন উদারনৈতিক অর্থনীতি রেল ও বিদ্যুতের বিল মেটাতে বলে বসলে দেওয়াসের নরকে পরিণত হতে কত সময় লাগবে?

জলের ব্যাপারে নিপাট বোকামির উদাহরণ বড় কম নেই। মধ্যপ্রদেশের সাগর শহরকেই যদি উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে প্রায় ছশো বছর আগে কোন লাখা বাঞ্জারার তৈরী করা সাগর নামের এক বিশাল পুকুরের পাড়ে গড়ে ওঠা এই শহরের নামই হয়ে যায় 'সাগর'। আজ এখানে নব্য সমাজের চার-চারটে বড় বড় প্রতিষ্ঠিত সংস্থা রয়েছে- পুলিশ প্রশিক্ষন কেন্দ্র, সেনাবাহিনীর মহার রেজিমেন্টের প্রধান কেন্দ্র, পৌরসভা, স্যার হরি সিং গৌর-এর নামে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়। এক বাঞ্জারা এখানে আসে এবং বিশাল সাগর তৈরী করে চলে যায়। কিন্তু আর্থিক ভাবে সম্পন্ন নব্য সমাজের এই চার-চারটি প্রতিষ্ঠান সেটির রক্ষণাবেক্ষণ পর্যন্ত করতে পারছে না। সাগর পুকুরের ওপর অনেক গবেষণা পত্র লেখা হয়ে গেছে। তাদের ডিগ্রী দেওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু লেখাপড়া না জানা এক লাখা বাঞ্জারার হাতের তৈরী সাগরকে লেখাপড়া জানা অগ্রসর সমাজ বাঁচাতে পর্যন্ত পারছে না!

উপেক্ষার এই সময়েও কিছু পুকুর আজও দাঁড়িয়ে আছে। সারা দেশ প্রায় আট থেকে দশ লাখ পুকুর বর্ষার জলে ভরে ওঠে এবং সুপাত্রের সঙ্গে কুপাত্রকেও জল দিয়ে চলেছে। টিকে থাকার পেছনে পুকুরগুলির মজবুত গঠন অবশ্যই একটি কারণ কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। তাহলে তো শক্ত পাথরে তৈরী দুর্গ কোনদিনই ধ্বংসস্তুপে পরিণত হতো না। সমাজ আজ অনেক দিক থেকেই ভেঙ্গে পড়েছে কিন্তু তবু আজও সমাজের মনে পুকুরের স্মৃতি বেঁচে আছে। স্মৃতির এই দৃঢ়তা পাথরের থেকেও দৃঢ়।

ছত্রিশগড়ের গ্রামগুলিতে এখনও ছের-ছেরার গান গাওয়া হয় এবং তার থেকে পাওয়া আনাজে পুকুরগুলি সংস্কার হয়। আজও বুন্দেলখণ্ডে কাজলির গানে আট অঙ্গ ডুবতে পারার কামনা করা হয়। হরিয়ানার নারনোল-এ জাত নামানোর পর মা-বাবা পুকুরের মাটি কেটে পাড়ে দেয়। না জানি কত শহর কত গ্রাম এই পুকুরের জোরেই টিকে আছে। অনেক পৌরসভাই আজও এই পুকুরের কারণেই পালিত হচ্ছে। সেচ দপ্তরও পুকুরগুলির দমেই সেচের জল দিতে পারে। বিজা-র ডাহর মতো গ্রামগুলিতে আজও সাগরের সেই নায়ক নতুন পুকুর খুঁড়ছে এবং প্রথম বর্ষায় তাতে রাতভর পাহারা দিচ্ছে। ওদিকে আজও প্রতিদিন সূর্য ঘড়সীসরে সকাল-সন্ধ্যা মনভর সোনা ঢেলে যায়।

কিছু কানে আজও সেই স্বর গুন গুন করে :

'ভালো ভালো কাজ করে যেও।'

তথ্যসূত্র

পাড়ের ধারে রাখা ইতিহাস

খাঁটি সোনায় তৈরী পুকুরের কাহিনী, ১৯০৭ সালের গেজেটিয়ার বাদ দিলে ইতিহাসের অন্য কোন ইংরেজী বইয়ে পাওয়া যায় না। কিন্তু পুকুরের এই কাহিনী মধ্যপ্রদেশের রিবা, সতনা, জব্বলপুর ও মণ্ডলা জেলায় গ্রামে গ্রামে শোনা যায়।

শ্রী ভূপতি সিংহ-এর লেখা বই, 'পাটন তহসিলের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস'-এ এই কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। কাহিনীতে বর্ণিত বিশাল পুকুরের মধ্যে এক কুণ্ডম সাগর থেকে বেরনো হিরণ নদীর কথাও এই বিবরণে বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে।

এই এলাকার পরিচয় ও এখানে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে তা আমরা পেয়েছি 'জনসত্তা', নতুন দিল্লীর শ্রী মনোহর নায়েকের কাছে।

শ্রী বৃন্দাবনলাল বর্মার উপন্যাস 'রানী দুর্গাবতী'-তেও বুন্দেলখণ্ড এলাকার পরশ থেকে তৈরী পুকুরগুলির উল্লেখ অন্য একঅর্থে পাওয়া যায়।

জব্বলপুর প্রাধিকরণ থেকে ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত জব্বলপুর স্মারকগ্রন্থে এই গল্পের উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও ১৯৩৯ সালে জব্বলপুরের কাছাকাছি যে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে ছাপা গাইডেও এই গল্পে বর্ণিত এলাকার কয়েকটি বিশাল বিশাল পুকুরের বিবরণ দেওয়া হয়েছিলো। স্বাধীনতা সংগ্রামের মাঝেএই ঐতিহাসিক সম্মেলনে যেখানে শ্রী সুভাষচন্দ্র বসু ও শ্রী পট্টাভী সীতারামাইয়ার মতো নেতা উপস্থিত ছিলেন, সেখানেও পুকুরের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক মনে করা হয়নি।

কিন্তু এই প্রসঙ্গের তুলনা করা যায় ১৯৯১সালে তিরুপতি কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গে। প্রচণ্ড জলসঙ্কটের সময় আয়োজিত এই সম্মেলনের প্যাণ্ডেল টাঙানো হয়েছিলো 'অবিলল' নামে এক বিশাল পুকুরের শুকিয়ে যাওয়া আগরের ওপর। আগরের আদ্রতার জন্য প্যাণ্ডেলের ভেতরের তাপমাত্রা বাইরের থেকে চারডিগ্রী কম ছিলো। কিন্তু এই অধিবেশনে উপস্থিত আমাদের নতুন প্রজন্মের আত্মমুগ্ধ নেতাগন দেশের সামনে ছেয়ে থাকা বিভিন্ন প্রকার সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য লোকবুদ্ধির ওপর কোন প্রকার ভরসা করেনি। এই রকমই ১৯৯৩ সালে কংগ্রেস অধিবেশন দিল্লী সীমানার সুরজকুণ্ডে হয়েছিলো। এই ঐতিহাসিক পুকুরটিও ভরাট

করে দেওয়া হয়েছে। সর্বত্র পুকুরগুলিকে এই উপেক্ষা করার অনুপাতেই জল সঙ্কট বেড়ে চলেছে।

মহাভারতের সময়ের পুকুরগুলির মধ্যে কুরুক্ষেত্রের ব্রহ্মাসর, করনাল-এর কর্ণঝিল ও মিরাটের কাছে হস্তিনাপুরে শুক্রতাল আজও আছে এবং উৎসবের সময় লক্ষ লক্ষ লোক জমা হয়।

রামায়ণের কালের পুকুরগুলির মধ্যে শৃঙ্গেয়রপুরের পুকুর প্রসিদ্ধ। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষন-এর নির্দেশক শ্রী বি বি লাল পুরনো তথ্যের ভিত্তিতে এলাহাবাদ থেকে ষাট কিলোমিটার দূরে খোঁড়া এই পুকুরটি খুঁজে বার করেছেন। শ্রী লালের মতানুসারে এই পুকুরটি খ্রীঃ পূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে তৈরী হয়েছিলো। অর্থাৎ আজ থেকে ২৭০০ বছর আগে।

শৃঙ্গাপুরের পুকুরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত বই 'হামারা পর্যাবরণ'(১৯৮৮)-এ, এবং বিস্তৃত বিবরণ নতুন দিল্লীর 'সেন্টার ফর সায়েন্স এন্ড এনভারমেন্ট'-এর মাধ্যমে, দেশের ঐতিহ্যময় জল সংগ্রহ প্রণালীর ওপর আয়োজিত সম্মেলনে শ্রী লালের লেখা ইংরাজী প্রবন্ধে পাওয়া যায়।

পনেরশো থেকে আঠারশো শতাব্দী পর্যন্ত সমাজের, তার সংগঠনের, বিদ্যাকেন্দ্রের বিস্তৃত বিবরণ শ্রী ধর্মপালের লেখা 'ইন্ডিয়ান সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইন এইটিন্থ সেঞ্চুরি' এবং 'দা বিউটিফুল ট্রি' বইয়ে পাওয়া যায়। প্রকাশক - বিবলিয়া ইম্পোক্স প্রাইভেট লিমিটেড্ ২/১৮ আনসারি রোড, নতুন দিল্লী-২।

এই বিষয়ের ওপরই ভিন্ন প্রসঙ্গে রুড়কী ইঞ্জিয়ারিং কলেজের ওপর লেখা ইতিহাস বই 'হিষ্ট্রি অফ থমসন কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং'-এ খুব সুন্দর উল্লেখ রয়েছে। হয়তো খুব কম লোকই জানেন যে দেশের প্রথম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কলকাতা, বোম্বে বা দিল্লীর মতো বড় শহরে নয়, হরিদ্বারের কাছে রুড়কী নামের একটি ছোট্ট গ্রামে ১৮৪৭ সালে খোলা হয়। এখানে কলেজ খোলার প্রধান কারণ ছিলো কুড়ি বছর আগে তৈরী হওয়া ইন্দিরা নহর। এই নহরটি সালোনি নামের একটি নদীর ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। নহর, নদীর ওপর দিয়ে নহর পার করা এ সমস্ত কাজই করেছিলেন এই এলাকায় বসবাসকারী গজধরেরা। যা দেখে সেই সময়ের গর্ভনর থমসন এই প্রতিভাশালী গজধরদের উত্তম প্রশিক্ষণের জন্য রুড়কীতেই কলেজ খোলার জন্য ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে অনুরোধ

করেন। এই কলেজটি শুধু ভারতের মধ্যেই নয় পুরো এশিয়ার মধ্যে প্রথম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। এই প্রসঙ্গে যে বইটি থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে সেটি হলো - লেখক কে ভি মিত্তল, ৭৯/২ সিভিল লাইন্স, রুড়কী উত্তর প্রদেশ। এই বইটিই আমাদের পরিচয় করায় ডঃ জি ডি অগ্রওয়ালের সঙ্গে। উনি কানপুর আই আই টির অধ্যক্ষ ছিলেন এবং এ বিষয়ে আধুনিকতম লেখাপড়ার সঙ্গে তিনি গজধরদের পরম্পরাকেও সম্মান করেন। ওনার ঠিকানা হলো প্রমোদ বন, চিত্রকুট ধাম, করওয়ী, জেলা বান্দা, উত্তরপ্রদেশ।

এই বিষয়ের ওপর পুনের সংস্থা 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন-ফর কালচারাল ফ্রিডম'-এ শ্রী ধর্মপাল ভাষণ দিয়েছিলেন। এই ভাষণ নতুন দিল্লীর দৈনিক হিন্দীপত্র 'জনসত্তা' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করে যা পরে শতাব্দী প্রকাশন, ৪৮ স্বর্ণকার কলোনী, বিদিশা, মধ্যপ্রদেশের পক্ষ থেকে 'ইংরেজদের আগের ভারত' নাম দিয়ে বই আকারে প্রকাশিত হয়। গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত শ্রী রমেশ মিশ্র পঙ্কজ-এর বই 'আজ কি উপেক্ষাঁয়ে' এবং 'নদীয়া অউর হম'-এও এই বিস্তৃত কিন্তু প্রায় বিস্মৃত বিষয়ের সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে।

রিবার পুকুরগুলির তথ্য ১৯০৭ সালের গেজেটিয়ার থেকে নেওয়া হয়েছে। সেই সময়ের রিবা রিয়াসতে পড়তো যে সমস্ত গ্রামগুলি তার পুকুরগুলির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় এই গেজেটিয়ারে।

থর মরুভূমিতে জলের কাজের জন্য শ্রী ওম থানবী, সম্পাদক, 'জনসত্তা', চন্ডীগড়। শ্রী শুভু পটওয়া, ভীনাসর, বিকানের। শ্রী সুরেন্দ্রমল মোহনত, মরুভূমি বিজ্ঞান কেন্দ্র, ১০৯ নেহেরু পার্ক, যোধপুর-এ এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

দিল্লীর তিনশো পঞ্চাশ পুকুরের উল্লেখ ১৯৭১ সালে আদমসুমারীর রির্পোটে, মাছ পালন প্রবন্ধে পাওয়া পুরনো পরিসংখ্যানগুলিতে শুধুমাত্র একটি পংক্তিতে পাওয়া যায়। ঐ প্রান্তটুকু নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমরা ভারতীয় মানচিত্র সর্বক্ষণ বিভাগ থেকে ১৮০৭ সালের দিল্লীর ওপর সম্প্রতি ছাপা এক নক্সায় অনেক পুকুর পাই।

এই ব্যাপারেই শ্রী মহম্মদ শাহীদের সৌজন্যে পাওয়া ১৯৩০

সালের দিল্লীর এক দুর্লভ নক্সায় ঐ সময়ের শহরে পুকুর ও কুয়োর গুনতি প্রায় তিনশো পঞ্চাশের সংখ্যা ছুয়ে থাকে। শাহিদজীর সঙ্গে ২৫৮৩ চুড়িওলান, দিল্লী-৬, এ যোগাযোগ করা যেতে পারে।

দক্ষিণের রাজ্য বিশেষ করে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি, মহিশূর ও মাদ্রাজের পুকুরগুলির বিস্তার, সংখ্যা ও পরিচালনার ব্যাপারে এই এলাকার গেজেটিয়ার, সেচ ও প্রশাসনিক রির্পোট থেকে প্রচুর সাহায্য পাওয়া গেছে। এই সংযোজনে ১৯৮৩-র কর্ণাটক রাজ্য যোজনা বিভাগের শ্রী এম জী ভট্ট, শ্রী রামনাথ্ন চেট্টী ও শ্রী অম্বাজী রাও দ্বারা তৈরী করা এক রির্পোট থেকেও সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

এর মধ্যে প্রগতিশীল রূপে চিহ্নিত কর্নাটক রাজ্যে জল সঙ্কট ক্রমশ বেড়েই চলেছে। কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায় সরকার সে বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করছে। সুখের কথা হলো, এ ব্যাপারে সরকার পুকুরের ওপরই সবথেকে বেশী ভরসা করছে। ১৯৯৯ সালে কর্নাটক সরকার একটি আধা-সরকারী সংস্থা গঠন করে। সংস্থাটির নাম 'জল সংবর্ধনা যোজনা সঙ্ঘ'। ২০০২- এর ৫ই জুন কর্নাটক সরকার জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্যের পুকুরগুলি সংস্কার ও দেখাশোনা করার এবং নতুন পুকুর খোঁড়ারও শপথ নেন। দিল্লীর প্রধান প্রধান কাগজগুলিতে এর বিজ্ঞাপনও ছাপা হয়। সরকার স্বীকার করে নেয় পুকুরের কাজ এখানে দীর্ঘকাল থেকে হয়ে আসছিলো এবং এখনও পুকুরগুলিই খাঁটি।

ভিত থেকে শিখর পর্যন্ত

একটা পুকুর কি ভাবে সম্পূর্ণ আকার ধারণ করে - এর প্রায় পুরো তথ্যই আমরা পাই আলওয়ার জেলার ভীকমপুরা কিশোরী গ্রামের সংস্থা 'তরুন ভারত সংঘ'-এর শ্রী রাজেন্দ্র সিং এর কাছে। সংঘ গত কুড়ি বছরে এই এলাকায় সাড়ে সাত হাজারেরও বেশী পুকুর গ্রামের লোকেদের সঙ্গে মিলেমিশে তৈরী করেছে।

পুকুর খোঁড়ার সময় নেওয়া হয়েছে, জব্বলপুর থেকে প্রতি বছর যে হাজার হাজার পাঁজি প্রকাশিত হচ্ছে তার থেকে। প্রকাশক- লালা রামস্বরূপ রাম নারায়ণ পঞ্চাঙ্গ, ৯৪ লার্ডগঞ্জ, জব্বলপুর, মধপ্রেদেশ। বাংলায় এই পঞ্চাগকে পাঁজি বলা হয়। গুপ্তপ্রেস ও বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রকাশনের পাঁজি বাংলার ঘরে ঘরে পাওয়া যায়।

এই রকমই পাঁজি বেনারস, এলাহাবাদ, মথুরা, আমেদাবাদ পুনে, নাসিক এবং দক্ষিনেরও অনেক শহরে ছাপা হয় এবং সমাজের স্মৃতিতে সম্মিলিত পুকুর ও কুয়োর কাজ আরম্ভ করার মুহূর্ত বার বার বলে থাকে।

ঘাটেয়াবাবার বিবরণ পেয়েছি হোশঙ্গাবাদের শ্রীরাকেশ দীওয়ানের কাছে। তাঁর ঠিকানা - কসেরা মহল্লা, হৌশঙ্গাবাদ, মধ্যপ্রদেশ। হিন্দীর পুরোনো অভিধানে এইরকম শব্দ সম্পূর্ণ অর্থসহ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে আমরা শ্রীরামচন্দ্র বর্মার প্রামাণিক হিন্দী অভিধান, প্রকাশক হিন্দী সাহিত্য কুটীর, হাতীগলি, বেনারস থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়েছি।

তুলসী দাসজীর লেখায় এই অংশের সারমর্মটুকু খুব সহজ ভাবেই প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

সংসার সাগরের নায়ক

সব জায়গাতেই পুকুর রয়েছে এবং সব জায়গাতেই তা তৈরী করার লোকও। এই রাষ্ট্রনির্মাতাদের, বর্তমান সমাজের লেখা-পড়া জানা লোক এবং যারা লেখে, পড়ে তারা কি করে ভুলে গেলো, সে কথা সহজে বোঝা যায় না!

পরিচয়হীন করে দেওয়া এই লোকগুলিকে আজ ফিরে বুঝতে গেলে বর্তমানের নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি উল্লেখযোগ্য কোন সাহায্য করতে পারে না। এক তো এই প্রতিষ্ঠানগুলি এঁদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না; আর যদিও বা কোন প্রকারে পারে তো মিস্ত্রী বা রাজমিস্ত্রীর বেশী ভাবতে পারে না। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে যদিও বা এঁরা জায়গা পেয়েও থাকেন তাহলে তা অদক্ষ শ্রমিক বা খুব বেশী হলে শ্রমিক। এই নবনির্মিত পরিকাঠামোগুলিতে এমন লোক ও সংস্থা রয়েছে যারা লোক ক্ষমতার ওপর আস্থা তো রাখে কিন্তু তাদের বুদ্ধিকে স্বীকার করে নিতে পারে না। তাই খ্যাতিহীন করে দেওয়া এই লোকেদের কাছ পর্যন্ত আমরা খ্যাতিহীন লোকের মাধ্যমেই পৌঁছাতে পেরেছি।

রাজস্থানের গজধরের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে বুঝতে জয়সলমেরের শ্রী ভগবানদাস মাহেশ্বরী ও শ্রী ভংওরলাল সুথার তথা জয়পুরের শ্রী রমেশ থানবীর কাছে প্রচুর সাহায্য পাওয়া গেছে। এঁদের ঠিকানা হলো - শ্রী ভগবানদাস মাহেশ্বরী, পটওয়ি কী হাভেলি, জয়সলমের।

শ্রী ভংওরলাল সুথার, রাজোতিয়াবাস, জয়সলমের। শ্রী রমেশ থানবী, রাজস্থান প্রৌঢ় শিক্ষণ সমিতি, ৭এ, ঝাঁলনা ডুঁগরি সংস্থান ক্ষেত্র, জয়পুর।

এই অধ্যায়ের নায়কদের অধিকাংশ পরিচিতি দেওয়া হয়েছে মৌখিক কথাবার্তা ওপর ভিত্তি করে। যতটা লিখিত সামগ্রীর ওপর নজর পড়েছে তা মুখ্যত গবেষণা কার্যের রূপান্তর, গেজেটিয়ার, পুরোনো রেকর্ড বা রিপোর্ট। শাস্ত্রীয় গ্রন্থের মধ্যে বাস্তুশাস্ত্র, মনসারসীরীস অথবা সমরাঙ্গণসূত্রধর-এর মতো জটিল গ্রন্থেই উল্লেখ পাওয়া গেছে। মনে করা হয় যে ষোলশ শতাব্দীর কাছাকাছি নায়ক শিল্পীদের সংগঠন ভাঙ্গতে শুরু করে এবং সেইসঙ্গেই এই শিল্পের সঙ্গে সমন্বিত বিভিন্ন গ্রন্থগুলিও লুপ্ত হতে থাকে।

এইরকম সঙ্কটের সময়েই গুজরাট, পাটনের সোমপুরা অঞ্চলে শিল্পী সূত্রধর নাথুজীর জন্ম হয়। তিনি নিজের আত্মীস্বজনদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বইগুলি সংগ্রহ করেন ও সংস্কৃতে 'বাস্তুমঞ্জরী' রচনা করেন। স্থপতি শ্রী প্রভাশঙ্কর ওধড়ভাও সোমপুরা এই গ্রন্থেরই মধ্যভাগ 'প্রসাদ মঞ্জরীর'-র গুজরাটী অনুবাদ করেন। এই কাজের ধারাবাহিকতাতেই শ্রী ভারতানন্দ সোমপুরা এটি হিন্দী পাঠকদের জন্য ১৯৬৪ সালে প্রস্তুত করেন।

এই বইয়ের ভূমিকা শিল্পীদের বৈচিত্রের প্রতি সুন্দর আলোকপাত করেছে। এঁরা হলেন স্থপতি, অর্থাৎ যাঁদের স্থাপত্যের স্থাপনায় সম্পূর্ণ যোগ্যতা রযেছে। এঁদের গুণ ও কমের অনুসরণকারী পুত্র বা শিষ্যকে সূত্রগ্রাহী বলা হয়। এঁরা রেখা চিত্র অঙ্কন থেকে শুরু করে স্থাপত্যের সকল কার্য সঞ্চালনে নিপুণ হন। মুখের ভাষা বা চলিত কথায় এঁরা 'সূতার-ছোড়ো' নামেও পরিচিতি পেয়েছেন। 'সূত্রমান প্রমান' সম্পর্কে জ্ঞানপ্রাপ্ত তক্ষক পাথরের ছোট, বড় কাজ নিজেরাই করেন। এঁরা কাঠ ও মাটির কাজেও যথেষ্ট দক্ষ হন।

কিন্তু কেবল কুশলতা বা দক্ষতাই শ্রেষ্ঠ শিল্পীর পরিচয় নয়, বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে শিল্পীর দোষ-গুণও যজমান ভালোভাবে যাচাই করে নেন। গুণের সঙ্গে আচরণে গুণবান হন যিনি তিনিই শ্রেষ্ঠ শিল্পী হতে পারেন। ধার্মিক, সদাচারী, মিষ্টভাষী, চরিত্রবান, অ-কপট, নির্লোভী, বহুবন্ধু রয়েছে যাঁর, নিরোগ, দোষহীন শরীর হওয়াও ততটাই গুরুত্বপূর্ণ যতটা নাকি রেখাচিত্রে দক্ষ হওয়া বা

গণিতের জ্ঞাতা হওয়া। সমাজ তৈরী ও পরিচালনা করেন যে শিল্পী পরিবার তাদের ঠিক মতো বুঝতে এই বইয়ের ভূমিকা যথেষ্ট উপযোগী হতে পারে।

ওড়িষার মহাপাত্র ও তাদের সঙ্গে যুক্ত শিল্পী পরিবারগুলি এখন পুরী ও ভুবনেশ্বরে বসবাস করছেন। এঁদের পূর্বপুরুষেরাই পুরী ও ভুবনেশ্বরের সুন্দর মন্দিরগুলি নিমাণ করেছিলেন।

অনঙ্গপালের দিল্লী ও সেই সময় একাদশ শতাব্দীতে মহারৌলির কাছে তৈরী অনঙ্গতাল নামক পুকুরটি পুরাতত্ত্ব বিভাগ কয়েক বছর আগে খুঁজে বের করেছে। যোগমায়া মন্দিরের পিছনে খোঁড়াখুঁড়ি তখনও শেষ হয়নি কিন্তু পাথরের সিঁড়িতে সজ্জিত এক গভীর লম্বা চওড়া পুকুরের আকার স্পষ্ট হয়ে উঠছিলো।

মাটির গভীরে জল দেখতে পাওয়া সিরভাবদের ব্যাপারে বিকানের-এর শ্রী নারায়ন পরিহার, শ্রী পূনমচন্দ্র এবং মধ্যপ্রদেশের নরসিংহপুরের কৃষক শ্রী কেশবানন্দ মিশ্রের কাছে তথ্য পেয়েছি।

পথরোট, টকারি, মটকুট, সোনকরের মত নাম ধীরে ধীরে ভাষার থেকে সরে গেছে তাই নতুন অভিধানে এগুলি পাওয়া যায় না। এগুলির সূচনা আমরা এই শব্দগুলির মতোই পুরোনো হয়ে যাওয়া অভিধানে পেয়েছি।

বনবাসী সমাজের জন্য এমনিতে বলার জন্য অনেক গবেষণা গ্রন্থই আছে কিন্তু এগুলি বেশির ভাগই খাওয়া দাওয়া রহন-সহন-এর বর্ণনা করে থাকে; সেটাও এমন শৈলীতে যেন তাদের অন্নজল আলাদা ছিলো। বাজে রকমের কৌতূহল বা এক বিচিত্র উপকারের ভাবনায় ভরপুর এইরকম সাহিত্যে বনবাসী সমাজের উৎকৃষ্ট গুণগুলির বা জলের সঙ্গে সম্পর্কিত টেকনিক্যাল দক্ষতার পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। এই গুণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা ভীল সেবা সংঘ থেকে প্রকাশিত 'ভোগীলাল পণ্ডিয়া স্মৃতিগ্রন্থ' থেকে পেয়েছি। বাঞ্জারাদের প্রবন্ধে শাহজাহ'র উজিরের প্রসঙ্গ বরার-ক্ষেত্রের পুরোনো দস্তাবেজে দেখতে পাওয়া যাবে। এ ব্যাপারে আরও সাহায্য পাওয়া যেতে পারে, শ্রী এস সি লায়ল-এর তৈরী করা বরার জেলা গেজেটিয়ার, ১৮৭০, বরার সেন্সাস ১৮৮১ সাল।

মধ্যপ্রদেশের বুন্দেলখণ্ড ও ছত্রিশগড়ে বাঞ্জারাদের পুকুর তৈরীর সূচনা আমাদের দেন শ্রী পঙ্কজ চতুর্বেদী, মহোবা নাকা, ছতরপুর ও শ্রী রাকেশ দীওয়ান, মধ্যপ্রদেশ।

ওড়িয়াদের ব্যাপারে মৌখিক তথ্য শ্রী দীনদয়াল ওঝার কাছে ও লিখিত তথ্য দিল্লীর শ্রী মহম্মদ সাহীদের সৌজন্যে পাওয়া 'জাতি ভাস্কর' নামক এক দুর্লভ বই থেকে নেওয়া হয়েছে। বইটি লিখেছিলেন মুরাদাবাদ নিবাসী বিদ্যাবারিধি পন্ডিত শ্রী জওলাপ্রসাদ। হিন্দী অনুবাদ করেন শ্রী খেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস। ১৯২৮ সালে মুম্বাই-এর ছাপাখানা থেকে এটি প্রকাশিত হয়।

আজকের আধুনিক সমাজে জসমা ওঢ়ন লোক-কথা-গাঁথা জীবন-শৈলী কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার পাত্র হতে পারে, কিন্তু লোক নায়িকা কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। তবুও জসমার অদ্ভুত যশ আজও রাজস্থানের লাঙ্গা সমাজের সুরে গুঞ্জরিত হয় এবং গুজরাতের নাচ 'ভবই'-এর তালে পা মিলিয়ে নিজেদের বিস্মৃতির অতল থেকে স্নেহ, মান ও শ্রদ্ধার জন্য বাঁচিয়ে রাখে।

জসমা ওঢ়নের জীবনী রঙ্গীন পাতায় 'অমর চিত্রকথা সিরিজ' ১৯৭৭ সালে শেষবারের মতো ছেপেছিলো। বর্তমানে হারিয়ে যাওয়া এই সংখ্যাটি আমরা দশমবর্ষের ছাত্র শ্রী ইন্দ্রজিৎ রায়-এর কাছে পাই। তার ঠিকানা -এইচ ১৪, কৈলাশ কলোনি, নতুন দিল্লী।

এই ধারাবাহিকতাতেই দেখে নেওয়া যেতে পারে সুশ্রী শান্তা গান্ধীর নাটক 'জসমা ওঢ়ন', প্রকাশক - রাধাকৃষ্ণ প্রকাশন, ২/৩৮ আনসারী রোড, দরিয়াগঞ্জ, নতুন দিল্লী।

ইন্দিরা নহরের ওড়িয়াদের বিষয়ে আরও বেশি জানার থাকলে উরমূল ট্রাস্টের আয়োজিত নহর যাত্রার জন্য যে রির্পোট তৈরী করা হয়েছিলো তাতে পাওয়া যেতে পারে।

ওড়িষার পুকুগুলি যাঁরা করেছিলেন তাঁদের প্রাথমিক তথ্য আমরা পেয়েছি, গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠানের শ্রীমতী কাজল পন্ডিয়া ও শ্রী পারস ভাই প্রদাতা, গ্রাম উদয়গিরি, ফুলবনী, ওড়িষা।

খরিয়া জাতির পরিচয় মধপ্রদেশ সরকারের পত্রিকা 'মধ্যপ্রদেশ সন্দেশ'- এর বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয় থেকে পাওয়া গেছে।

মুসহর ও ডাঢ়িদের পুকুরের সঙ্গে অটুট সম্বন্ধের পরিচয় আমরা বিহারের শ্রী তপেশ্বর ভাই ও গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠানের শ্রী নির্মল চন্দ্রের কাছে পেয়েছি। উত্তরে হিমাচল ও পাঞ্জাব থেকে শুরু করে মধ্যে নাসিক, ভাণ্ডারা পর্যন্ত পুকুরের ধারাবাহিকতায় কোহলিয়দের বিশিষ্ট পরিচয় সর্বসেবা সঙ্ঘ, গোপুরী, ওর্ধা-র শ্রী

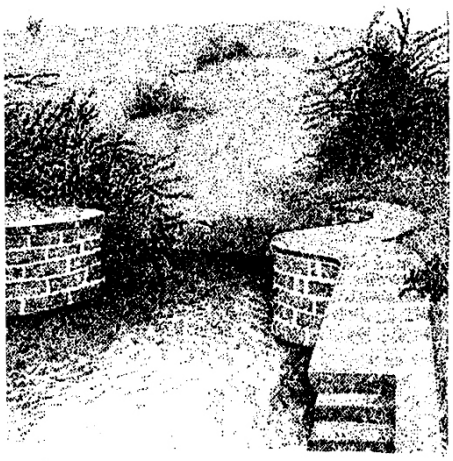

ঠাকুরদাস বঙ্গ, শ্রী বসন্ত বোম্বটকর 'সেন্টার ফর সায়েন্স এন্ড এনভারমেন্ট,' এফ-৬, কৈলাস কলোনী, নতুন দিল্লীর শ্রী অনিল অগ্রওয়াল তথা শ্রী মোহন হীরাবাঈ, দেশাই গঞ্জ, গড় চিরৌলি, মহারাষ্ট্র থেকে পেয়েছি।

কোঙ্কনের গাওড়ি জাতির পরিচয় দিয়েছে গোয়ার সংস্থা, 'শান্তিময় সমাজ', পোষ্ট বান্দোড়ার শ্রী কলানন্দ মণি ও শ্রী নিরজ। এই বিষয়ের ওপরই লেখা শ্রী কলানন্দ মণির একটা লেখা গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠানের মাসিক পত্র গান্ধীমার্গ-এ ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

তামিলনাড়ুর সমৃদ্ধ এরি পরম্পরার ওপর মাদ্রাজের সংস্থা 'পেট্রিওটিক এন্ড পিপল্‌স ওরিয়েন্টেড সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি গ্রুপ' প্রচুর কাজ করেছে। এই বিষয়ের ওপর শ্রী টি এম মুকুন্দের লেখা সংস্থার পত্রিকা, পি পি এস টি বুলেটিন সংখ্যা ১৬, সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ ছাড়াও আমরা অনান্য প্রবন্ধ থেকেও ছোটখাটো বিষয় পেয়েছি।

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্য এলাকার জেলা দস্তাবেজে ইংরাজী লেখকদের জন্য পুকুর বিষয়ক ইংরাজীর দু তিনটি প্রচলিত শব্দ - ট্যাঙ্ক, রিজার্ভার প্রভৃতিতেই শেষ হয়ে যায়। এরি শব্দের উল্লেখ খুঁজলে হয়তো বা কোথাও পাওয়া যেতেও পারে! কিন্তু ১৯৫৫ শালে শ্রী এইচ এইচ উইলসন-এর লেখা একটি ব্যতিক্রমি বই 'গ্লসারি অফ জুডিসিয়াস রেভিনিউ টার্মস এন্ড অফ ইউসফুল ওয়ার্কস অকারিং ইন অফিসিয়াল ডকুমেন্টস, রিলেটিং টু দা এডমিনিসট্রেশান অফ দা গভর্নমেন্ট' - এই বিষয়ের সঙ্গে নিজেদের সমাজ সম্পর্কে সঠিক পরিচয় দেয়।

পলিওয়াল ব্রাহ্মনদের প্রারম্ভিক সূচনা শ্রী ভূটু পাটওয়ার-এর কাছে পাওয়া গেছে। মহারাষ্ট্রের চিতপাবন ও দেবরুখ ব্রাহ্মনদের কথা পূর্বে উল্লেখিত 'জাতি ভাস্কর' বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

পুষ্করণ ব্রাহ্মন ও পুষ্কর সরোবরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা কর্নেল ডাট-এর প্রসিদ্ধ বই 'এনেলস্ এন্টিবিউট অফ রাজস্থান'-এর হিন্দী অনুবাদ 'রাজস্থান কা ইতিহাস' (সম্পাদনা শ্রী বি আর মিশ্র, শ্রী জে পি মিশ্র ও শ্রী রায় মুন্সি দেবীপ্রসাদ) থেকে পেয়েছি।

ছত্রিশগড়ের রামনামি সম্প্রদায়ের ওপর 'মধ্যপ্রদেশ সন্দেশ'-

এর সংখ্যায় এখানে ওখানে কিছু পরিচয় রয়েছে।

সাগরের আগর

পুকুরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে আগৌরের বিভিন্ন নাম আমরা চণ্ডীপ্রশাদ ভট্ট পো: গোপেশ্বর, জেলা চমোলি, উঃ প্রঃ, শ্রী রাকেশ দীওয়ান, শ্রী গুনসাগর সত্যার্থী, পো: কুণ্ডেশ্বর, চিমকগড় মঃ প্রঃ। ও গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠান নতুন দিল্লী শ্রী রাজীব বোড়র কাছে পেয়েছি।

আগর ও পাড়ের সঙ্গে সম্পর্কিত শব্দগুলির পরিচয় শ্রী রমেশ থানবী ও শ্রী তপেশ্বর ভাই, পো: জগৎপুরা, ভায়া ঘোঙঘরডীহা, মধুবনী, বিহার থেকে পেয়েছি।

শিবসাগরের শৈল্পীক নেষ্টা আমরা শ্রী জয়প্রকাশ থানওয়ীর সৌজন্যে দেখতে পাই, থানওয়ীজীর ঠিকানা হলো - মুচিগলি, ফলৌদি, যোধপুর।

পাঁক আটকানোর প্রাসঙ্গিক বিবরণ শ্রী শুভু পাটওয়া ও তাঁরই গ্রাম ভিনাসর, বিকানের-এর শ্রী নারায়ন পরিহার ও জনসত্তা চণ্ডীগড়ের সম্পাদক শ্রী ওম থানবির কাছে পাওয়া গেছে।

পাঁকের আরও এক নাম কপা কাপু। পাঁক বার করার ব্যবস্থা তত দিনেরই পুরোনো যত দিনের পুরোনো পুকুর। বাস্তুশাস্ত্রের সংস্কৃত গ্রন্থ 'মানসার'-এ একে ঢিম বিধান বলা হয়েছে।

পঠিয়াল হথনি ও ঘাটৈয়াবাবর সঙ্গে সম্পর্কিত সামগ্রী, শ্রী ভগবানদাস মাহেশ্বরী ও শ্রী দীনদয়াল ওঝার সঙ্গে কোলাপাড়া জয়সলমেরে যে কথাবার্তা হয়েছিলো তার ওপর ভিত্তি করে লেখা।

স্তম্ভের বিভিন্নতা বুঝতে আমরা শ্রী রাকেশ দিওয়ান ও তাঁর বোন সুশ্রী ভারতী দিওয়ানের-এর কাছে প্রচুর সাহায্য পেয়েছি।

পুরুষ মাপের সূক্ষ্মতা আমরা বুঝেছি শ্রী নারায়ণ পরিহারের কাছে। এই সম্পর্কিত বাস্তুশিল্পের প্রাচীন গ্রন্থ, 'সমরাঙ্গন সূত্রধার'-এ অণু থেকে শুরু করে যোজন পর্যন্ত মাপ দেখতে পাওয়া যায়।

লাখেটা বিষয়ে পূর্ণ পরিচয় পেয়েছি ওস্তাদ নিজামুদ্দীনজীর কাছে। তাঁর ঠিকানা - বাল ভবন, কোটাল মার্গ, নতুন দিল্লী। ভোপালতালের মণ্ডিদ্বীপের কাহিনী শ্রী ব্রজমোহন পাণ্ডের বই 'পুরাতত্ত্ব প্রসঙ্গ'- তে দেখা যেতে পারে। এতে মণ্ডীদ্বীপ ছাড়াও অন্য কয়েকটি সিংহলদ্বীপেরও উল্লেখ রয়েছে। আজও এই এলাকাতে সিংহলদ্বীপ নামের কিছু গ্রাম পাওয়া যায়।

ডাটের সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তুসামগ্রী গোয়ার শ্রী কলানন্দ মণি, আলওয়ারের শ্রী রাজেন্দ্র সিং তথা চাকসু জয়পুরের শ্রী শরদ জোশীর সঙ্গে যাত্রাগুলি ছাড়াও শ্রী রামচন্দ্র বর্মার অভিধানে বর্ণিত এর সঙ্গে মিল রয়েছে চুরুণ্ডি, চুকরৌণ্ড প্রভৃতি শব্দের ভিত্তিতে তৈরী করা হয়েছে।

জল চুরির ব্যাপারে যে বুন্দেলী শব্দ, তা শ্রী সুনসাগর সত্যার্থীর কাছে পাওয়া গেছে।

সাফ মাথার সমাজ

পুকুরের আগৌর পরিষ্কার রাখার প্রারম্ভিক তথ্যে শ্রী শুভু পাটওয়ারের বিশেষ সহায়তা রয়েছে। মধ্যপ্রদেশ ও বিহারের পুকুরের সাফ-সাফাই -এর অধিকাংশ বিষয় শ্রী রাকেশ দীওয়ান ও তপেশ্বর ভাইয়ের কাছে পাওয়া গেছে। বিহার হিন্দী গ্রন্থ আকাদেমী, কদমকুয়াঁ, পাটনা থেকে প্রকাশিত শ্রী হবলদার ত্রিপাঠী 'সহৃদয়'-এর বই 'বিহার কী নদীয়াঁ'তে-ও দেখা যেতে পারে।

দক্ষিণে প্রচলিত ধর্মদা ও মান্যম প্রথার বিস্তার বোঝার জন্য এই বইগুলি থেকেও সাহায্য পাওয়া যায় - তামিলনাড়ু সরকারের ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত - 'হিস্ট্রি অফ ল্যাণ্ড রেভিনিউ সেটেলমেন্ট এন্ড বুলেটিন অফ ইন্টারমিডিওটারী টেনিয়ার্স ইন তামিলনাড়ু'- এই বইটি প্রসঙ্গে যে কথাটি উল্লেখযোগ্য তা হলো এ ধরনের বই আর দ্বিতীয়টি দেখা যায় না। বর্তমানে ক্লান্ত হয়ে পড়া সমাজ ও সরকারকে পরিচালিত করছে যে সরকারী প্রকল্পগুলি তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন সমাজে রচিত ও পরিচালিত সংস্থার ও তাদের ঐতিহ্যের সবিস্তার চিত্রন করেছে এই বইটি। এছাড়াও ডব্লু ফ্রান্সিসের লেখা (১৯০৬সাল) 'সাউথ আরকাট জেলা গেজেটিয়ার'-এও কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

গৈঙ্গজী কল্লার প্রসঙ্গ আমরা ফলৌদি, যোধপুরের শ্রী শিবরতন থানবীর কাছে এবং গৈঙ্গজী যে এলাকার পুকুরগুলি দেখাশোনা করতেন সেই পুকুরগুলির পরিচয় আমরা তাঁর পুত্র শ্রী জয়প্রকাশ থানবীর সঙ্গের কিছু যাত্রায় পেয়েছি। গৈঙ্গজী কল্লার মতো বিভূতি প্রায় প্রতিটি গ্রাম ও শহরের পুকুর ও নদীর ঘাটে উপস্থিত থাকতেন এবং সারা বছর পুকুরগুলির দেখাশোনা করতেন। ঘাটের ওপর আখড়ার প্রচলন এই কারণেই ছিলো বোধহয়। ১৯০০ সাল পর্যন্ত

যমুনার ঘাটে আখড়ার স্বেচ্ছাসেবকদের পাহারা থাকতো। এই ভাবেই এখানের পুকুর ও বাওড়িগুলিও আখড়ার দেখাশোনায় পরিষ্কার রাখা যেতো। আজ যেখানে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে সেখানে মলকাগঞ্জ-এর কাছে কখনও দীনার পুকুর ছিলো! এই আখড়ায় দেশ বিদেশের পালোয়ানের দলের আয়োজন করা হতো। দীনার পুকুরের প্রারম্ভিক পরিচয় আমরা শ্রী কৈলাস জৈন-এর কাছে পেয়েছিলাম। এই পুকুরের বিস্তৃত তথ্যের জন্য দিলীপকুমার, দ্রারা, শ্রী কিশোরীলাল, বিলডিং নং ৬২৯, গলি রবিন সিনেমা, সব্জিমন্ডী, মলকাগঞ্জ, দিল্লী ৭১-এ যোগাযোগ করা যেতে পারে।

লহ্াস-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে কর্ণেল টাড-এর লেখা 'এনল্স এন্ড এন্টিবিউটিস অফ রাজস্থান'-এর হিন্দী অনুবাদে দেওয়া সূচনার ওপর ভিত্তি করে।

নারনৈল হরিয়ানার প্রসিদ্ধ পুকুরে আজও মণ্ডন সংস্কারের পর সন্তানদের পিতা- মাতা পুকুর থেকে মাটি তুলে পাড়ে দেন। এই পরম্পরার বিস্তৃত তথ্য গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠান, নতুন দিল্লীর শ্রী রমেশ শর্মার কাছে পাওয়া যেতে পারে।

সহস্র নাম

দিল্লীর শ্রী রাজেন্দ্র কালিয়া ও তাঁর স্ত্রী সুশ্রী মুকুল কালিয়া দিল্লীর পুকুর, ডিগ্গি, হৌজ ও নহরগুলির ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। শ্রীমতী মুকুল পুরোনো দিল্লীর ওপর ছোটদের জন্য একটি সরস বইও লিখেছেন। প্রকাশক -গান্ধী শান্তি কেন্দ্র, বি-৫২, মধুবন, দিল্লী- ৯২। মুকুলজীর ঠিকানা -১৯৯, সহযোগ পোর্টমেন্টস, ময়ুর বিহার, দিল্লী।

আম্বালার ডিগ্গিগুলির পরিচয় আমরা ওখানের শ্রী দেবীশরন দেবেশ-এর কাছে পেয়েছি। ওনার ঠিকানা - গান্ধীশান্তি প্রতিষ্ঠান কেন্দ্র ১৬৩০ জয়প্রকাশ নারায়ণ মার্গ, আম্বালা, হরিয়ানা। লালকেল্লার লাহৌরি গেটের কাছে তৈরী লাল ডিগ্গীর সূচনা উর্দুতে লেখা স্যার সৈয়দ আহমেদ খাঁর বই 'আসারুস সনাদিদ'(সন ১৮৬৪) - থেকে পাওয়া গেছে। এই বইটি পর্যন্ত আমাদের পৌঁছাতে সাহায্য করেছিলেন গান্ধী সংগ্রহালয়ের শ্রী হরিশচন্দ্র মাথুর, গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠানের শ্রী এইচ এল ওধয়া।

পাঠকদের এটা জেনে আশ্চর্য লাগবে যে লাল ডিগ্গি এক ইংরেজ, লর্ড এডিনবরো তৈরী করিয়েছিলেন। রাজকর্মচারীদের

মধ্যে এটি তার নামেই পরিচিত ছিলো। কিন্তু দিল্লীর মানুষ একে লাল ডিগ্গিই বলতেন, কেননা পাঁচশো ফুট লম্বা ও দেড়শো ফুট চওড়া এই পুকুরটি লাল পাথর দিয়ে তৈরী করানো হয়েছিলো। ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হর্ণ-এর বই 'সেওন সিটিজ অফ ডেলহি'-তে লাল ডিগ্গির সুন্দর বিবরণ রয়েছে। দিল্লীর অন্য পুকুর নহর, বাউড়িগুলি বিষয়ে, কারস্টিফেনের 'আর্কিওলজি এন্ড মনুমেন্টাল রিমেন্স অফ ডেলহি', সন ১৮৭৬ ও শ্রী জি জি পেজের সম্পাদিত চারখন্ডে 'লিস্টঅফ মহমেডান এন্ড হিন্দু মনুমেন্ট্স ডেলহি প্রভিন্স', সন ১৯১৩ থেকেও অনেক সাহায্য পাওয়া যেতে পারে।

খন্ডোয়া-র কুণ্ডর পরিচয় শ্রী গোপীনাথ কালভোর, রতন মঞ্জিল, দুধ তলাই, খাণ্ডোয়া থেকে পাওয়া গিয়েছে।

টিহরি গাড়ওয়ালের বিহারীলাল হিমালয়ের পুকুরগুলি ও চালগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়েছেন। তাঁদের সংস্থা 'লোক জীবন বিকাশ ভারতী', বুঢ়া কেদার, পি তাথী নিজেদের অন্যান্য সামাজিক কাজের সঙ্গে সেখানে আবার ফিরে চালের প্রচলন শুরু করার চেষ্টা করছে। শ্রী মৈথিলীশরন গুপ্তর চিরগ্রামের চোপরার বিবরণ শ্রী গুণসাগর সত্যার্থীর কাছে পাওয়া গেছে।

ফুটেরা তাল, জনসত্তা নতুন দিল্লীর সুধীর জৈন-এর কাছে, বরাতিতাল 'বিহার কী নদীয়াঁ' বই থেকে এবং হা হা পঞ্চকুমারী তাল ও লখীসায়রের তিনশো পঁয়ষট্টি পুকুরের সঙ্গে সম্পর্কিত বিবরণ আমরা শ্রী নির্মলচন্দ্রের কাছে পেয়েছি।

জায়কেদার পুকুরের ওপর ইন্দোরের দৈনিকপত্র 'নঈ দুনিয়া'-র ১৭মে ১৯৯১-এর সংখ্যায় ছাপা শ্রী বাবুরাও ইংগলের লেখাটি পুকুরের সহস্রনামের আলাদা স্বাদে ভরপুর।

বারসনার পিলী পোখরের খবর সুশ্রী বিমলা দেবীর কাছে পেয়েছি। তাঁর সঙ্গে - ডঃ সুভাষচন্দ্র তোমর, চক্কিওয়ালা কটরা, বরসনা, জেলা মথুরা, উত্তরপ্রদেশে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

বিচিত্র গোলাতালের পরিচয় আমরা শ্রী শরদ যোশীর কাছে পেয়েছি। তিনিই জয়বান তোপ ও তার থেকে বেরিয়ে কুড়িমাইল দূরে পড়া গোলাতাল দেখারও ব্যবস্থা করেন।

দশফলা পদ্ধতির মৌখিক বিবরণ বাপটলা অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রী জি কে নারায়ণের কাছে পাওয়া গেছে। গান্ধী শান্তি কেন্দ্র হায়দরাবাদ থেকে অন্ধ্রের পরিবেশের ওপর তেলেগুতে প্রকাশিত

এক রির্পোটে এই এলাকার পুকুরগুলির বিবরণ রয়েছে। শৃঙ্খল পদ্ধতিতে জোড়া পুকুর অনেক জায়গাতেই করা হতো। দক্ষিণ ছাড়াও বুন্দেলখণ্ড রাজস্থান ও গুজরাতেও এই ব্যবস্থা দেখা যায়। মধ্যপ্রদেশের এই ধরনের পুকুরগুলির বর্ণনা ইন্দোরের দৈনিক পত্র 'নই দুনিয়া'-র ১৯৯১ সালে ১লা নভেম্বর সংখ্যায় শ্রী রামপ্রতাপ গুপ্তর লেখায় পাওয়া যায়। তাঁর ঠিকানা হলো রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়, রামপুরা, মন্দসৌর, মধ্যপ্রদেশ।

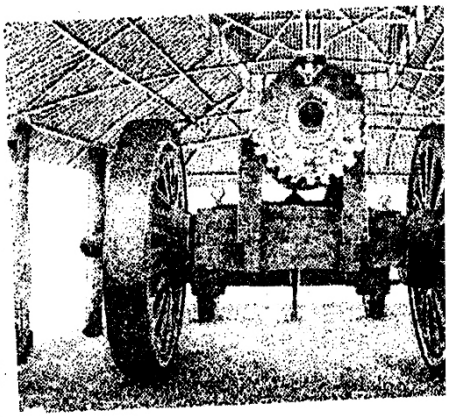

মুনৈরা মধ্যপ্রদেশের পড়াওলি গ্রামে সাত স্তরের পুকুরের শেকল ছিলো। পড়াওলির বিবরণের জন্য গোয়ালিওর সায়েন্স সেন্টারের অরুণ ভার্গব-এর সঙ্গে এল বি ১৭৬, দর্শন কলোনি, গোয়ালিয়রে যোগাযোগ করা যেতে পারে। ছিপলাই শব্দের সুন্দর ব্যবহার আমরা প্রথমবার ওস্তাদ শ্রী নিজামুদ্দীন-এর কাছে শুনতে পাই। এই প্রসঙ্গে ছত্রিশগড় ও বিহারের পুকুরের নামগুলি বুঝতে আমাদের শ্রী রাকেশ দিউয়ান ও শ্রী নির্মলচন্দ্র সাহায্য করেছেন। ভোপাল তালের বিস্তৃত বিবরণ শ্রী ব্রজমোহন পাণ্ডের বইয়ে পাওয়া যাবে। এতে দেশের কয়েকটি প্রাচীন পুকুরেরও পরিচয় আছে। পলওল স্থানের সূচনা আমরা পেয়েছি দিল্লীতে লোকশিল্পীদের নিয়ে কাজ করছে সংস্থা 'ভারতী'-র শ্রী ভগবতী প্রসাদ হটওয়ালের কাছে। ঠিকানা - সারথী, ফ্ল্যাট নং ৪, শঙ্কর মার্কেট, কনাট প্লেস নতুন দিল্লী- ১।

ঝুমরি তলৈয়া নামের সঙ্গে আমরা, দেশের হাজার হাজার মেয়েদের মতোই আকাশবাণীর বিবিধভারতী অনুষ্ঠানের দ্বারাই পরিচিত হয়েছি।

মরীচিকাকে মিথ্যা করে পুকুর

এই অংশটি লেখার জন্য আমরা রাজস্থান, জয়সলমের, বিকানের তথা বাড়মের জেলার গেজেটিয়ার ও হিন্দী এলাকার ১৯৮১ সালের জনগণনা রির্পোট থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছি। এ ছাড়াও বার বার যাতায়াতে মরুভূমি ও সেখানের সমাজের জল সম্বন্ধিত বুদ্ধিমত্তার আভাস পাওয়া গেছে। ১৯৯২ সালে কে কে বিড়লা, 'রাজস্থানের জলসংগ্রহ'-এই বিষয়ের ওপর অনুপম মিশ্রকে এক গবেষণা বৃত্তি দেয়। এই যাত্রার বেশিরভাগই এই বৃত্তিরই অন্তর্গত।

জয়সলমের শহর ও তার আশেপাশের পুকুরগুলির প্রারম্ভিক পরিচয় শ্রী নারায়ণলাল শর্মার লেখা 'জয়সলমের' নামক বই থেকে পাওয়া গেছে। প্রকাশক - গোয়েল ব্রার্দাস, সূরজ পোল, উদয়পুর।

এই এলাকা সম্পর্কে শ্রী ওম থানবী, শ্রী ভগবানদাস মাহেশ্বরী, শ্রী দীনদয়াল ওঝা ও রাজস্থান গো সেবাসঙ্ঘের শ্রী ভংওরলাল কোঠারীর সঙ্গে সময় সময় হওয়া কথবর্তা থেকে আমরা অনেক উপকৃত হয়েছি। রাজস্থান গো সেবা সঙ্ঘের ঠিকানা - রানী বাজার, বিকানের।

ঘড়সীসর পুকুরটির গড়সীসর বা গড়ীসর নামেও পরিচিতি রয়েছে। এই পুকুরের ধারে তৈরী মন্দির ঘাট, রান্নাঘর, পোল ও পুকুরে জমা হওয়া মেলার বর্ণনা আমরা উম্মেদ সিং মেহাতার গজল থেকে পেয়েছি। এই গজল 'জয়সলমেরীয় সঙ্গীতরত্নাকর', প্রথম খণ্ডে রয়েছে। বইটি লক্ষ্ণৌ-র নবকিশোর প্রেস থেকে ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হয়। এটি আমরা জয়সলমেরের শ্রী ভগবানদাস মাহেশ্বরীজীর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে পেয়েছি।

পুকুর বাঁধা ধর্মস্বভাব।

পুকুরের 'স্বভাবধর্মের' বর্ণনা ডিঙ্গল ভাষাকোষ থেকে পাওয়া গেছে। এটি ১৯৫৭ সালে নারায়ণ সিং ভাটির সম্পাদনায় রাজস্থান গবেষণা সংস্থা, চৌপাসনী, যোধপুর থেকে প্রকাশিত হয়। কোষের হমিরমালা খণ্ডে পুকুরের পর্যায়বাচী শব্দ গুণে কবি হমিরদান রতনু একে স্বভাব ধর্ম বলেছেন।

সুখ ও দুঃখের সঙ্গে পুকুরকে যুক্ত করার প্রসঙ্গ আমরা শ্রী ভগবান দাস মাহেশ্বরী, শ্রী রাজেন্দ্র সিং ও শ্রী কলানন্দ মণির কাছে পেয়েছি।

বুন্দেলখণ্ডের মাটির তলায় পোঁতা সম্পত্তি থেকে পুকুর তৈরীর বিবরণ শ্রী যোগেশ্বর প্রসাদ ত্রিপাঠীর সম্পাদনায় ব্রহ্মানন্দ মহাবিদ্যালয়, রাঠ হমিরপুর, উত্তরপ্রদেশ থেকে ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত 'স্বামী ব্রহ্মানন্দ অভিনন্দন' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। এই বইটিতে শ্রী বদ্রীপ্রসাদ ধবলের লেখা ' মহোবা নগরের সংক্ষিপ্ত পরিচয়'-এ বিক্রম সংবত ২৮৬ থেকে ১২৪০ পর্যন্ত চন্দেল বংশের রাজত্বের পরিচয় ও তার বাইশ প্রজন্মের বিস্তারিত

বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সেখানকার বাইশটি বড় পুকুরের নামও দেওয়া হয়েছে, এই নামগুলির ভিত্তিতেই। শ্রী ব্রহ্মানন্দ অভিনন্দন গ্রন্থটি আমরা পাই মহোবা-র শ্রী মনোজ পটেরিয়ার সৌজন্যে।

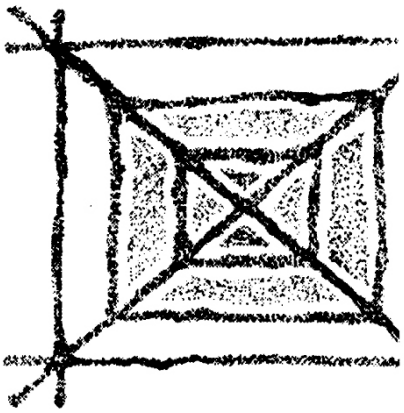

হাঁকডাকের সঙ্গে বিক্রি হওয়া এলাহাবাদী পেয়ারা ও নাগপুরী কমলার কথা সকলেই জানেন। কিন্তু বলদেব গড়ের মাছ? বাংলায় বলদেব গড়ের মাছ নিয়ে যাও, যেন এই রকম ডাক শোনা যায়। এই বলদেবগড় বাংলায় নয় বুন্দেলখণ্ডে। এখানের পুকুরের মাছ খুব স্বাদু বলে খ্যাতি রযেছে।

ছেরছেরা উৎসব ও ছত্রিশগড় সম্পর্কিত অন্যান্য সূচনা, পুকুরের বিয়ে ও বড় গ্রামের পরিভাষায় যে ছৈ আগর ছৈ কোরির কথা বলা হয়েছে তা রাকেশ দীওয়ান-এর দান।

সীতাবাউড়ি উল্কি করানো সম্পর্কিত তথ্য, মধ্যপ্রদেশ সরকার কত্তৃক প্রকাশিত চর্তুমাসিক পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা থেকে নেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কুরাঁও সমাজের মহিলাদের মধ্যে উল্কির ঐতিহ্যের ওপর দুটি পঙক্তি 'মাদ্রাজ ডিসট্রিক গেজেটিয়ার সিরিজে'-এ ডব্লু ফ্রান্সিসের লেখা সন ১৯০৬-এ 'সাউথ আরকট জেলা গেজেটিয়ার' থেকে পাওয়া গেছে।

বিন্দুসাগরের বর্ণনা করা হয়েছে কর্নেল বি এল বর্মার সঙ্গে মৌখিক আলোচনার থেকেই। ওনার ঠিকানা হলো এম ৪৯, গ্রেটর কৈলাশ, ভাগ ২, নতুন দিল্লী-৪৮। এই প্রসঙ্গে বেনারসের পুকুরগুলির নামও আবার বলা যেতে পারে। এগুলির নামকরণও সেই ভিত্তিতেই করা হয়েছিলো যে, দেশের সমস্ত নদীগুলির পবিত্র জল এখানেও সংগৃহীত রয়েছে। জেমস প্রিন্সেপ নামের এক ইংরেজ আধিকারীক ১৮২০ সালের কাছাকাছি বেনারস শহরের কিছু ভালো নক্সা করেছিলেন। এই নক্সায় পুকুরগুলির অবস্থান দেখানো হয়েছে। এই নক্সা ১৯৮৬তে ছাপা ডায়না এল ঐক-এর ইংরাজী বই 'বেনারস সিটি অফ লাইট'-এ দেওয়া হয়েছিলো। প্রকাশক -- রাউটলেজ এন্ড কৈগনপাল, লন্ডন।

পুকুরকে নদীর সঙ্গে যুক্ত করার প্রথা অনান্য এলাকাতেও রয়েছে। এই সম্বন্ধে ভব নগরের প্রসিদ্ধ গঙ্গাজলিয়া পুকুরের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

আজও পুকুরগুলি খাঁটি

অধিকাংশ শহর ও যে গ্রামগুলিতে তাদের পা প্রসারিত হয়ে চলেছে সেই গ্রামগুলিও বর্তমানে পুকুরের দুর্দশার প্রবন্ধ হয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

শ্রী রামেশ্বর মিশ্র-র সঙ্গে অমাদের যে কথাবার্তা হয়েছিলো তাঁর থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছি অধ্যায়ের প্রারম্ভিক ভাগ প্রস্তুত করার জন্য।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে তৈরী হচ্ছিলো যে বান্দেলা পুকুর সে তথ্য আমরা মধ্যপ্রদেশ সন্দেশের সেচ বিশেষ সংখ্যা ছাড়াও শ্রী জি এম হৈরিয়ট-এর ১৯০১-এ লেখা সেই সময়ের সেন্ট্রাল প্রভিন্সেস-এ এক সরকারী রিপোর্টেও দেখতে পাই। রিপোর্টটিতে এ এলাকার ছোট বড় পর্যাপ্ত বিবরণ রযেছে। গুণীজনখানা সম্পির্কিত সূচনা আমরা শ্রী নন্দকিশোর আচার্যর কাছে পেয়েছি। তাঁর ঠিকানা -সুথরো কী বড়ী গুওয়ার, বিকানের। মহীশূর রাজ্য বিষয়ে ১৯০১ সালে প্রকাশিত 'মেমোরান্ডাম অন ইরিগেশান ওয়ার্ক্স ইন মহীশূর' নামক এক রিপোর্ট, সরকারী বিভাগগুলির কারণে পুকুরের যে দুর্দশা তার ওপর সঠিক আলোকপাত করে।

'বর্গীয় গীতমালায়' গারিয়োদের মাঝে 'ফিরিঙ্গি নল মত লাগায়া দিও' -এই পঙক্তিগুলিতে আমাদের সমাজে বসবাসকারী স্বভাবের ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই। এই গীতমালাতে সমস্ত শুভ সময়ের - হোলি, বিয়ে, কুয়োপুজোর মতো পরব উৎসবে গীত গাওয়া গানগুলির সংগ্রহ রয়েছে। আলীগড়ের সুশ্রী রমাদেবী বর্গীয় এই গানগুলির সংকলন করেন এবং দিল্লীর সুশ্রী ত্রিবেণী দেবী এই গীতমালা ছেপে বিলি করেন। অন্যথা এ বই বিক্রির জন্য নয়। ত্রিবেণীজীর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে - ৭১৯ প্রেম গলি ১-ডি সুভাষ রোড্ গান্ধীনগর দিল্লী-৩১। অশোক প্রেস, ২৮১০, গলি মাতাওয়ালী, কিনারী বাজার, চাঁদনি চক, দিল্লী থেকে ১৯৯২-এ প্রকাশিত এই গীতমালায় প্রথম সংস্করণে এই বিয়ের গানটির উল্লেখ রয়েছে।

ইন্দোর ও দেওয়াস শহরে গত কুড়ি বছরে বেড়ে চলা জলসংকটের অধিকাংশ খবরাখবর সেখানের খবর কাগজের

সংবাদ ও সম্পাদকের নামে চিঠিপত্র থেকে নেওয়া হয়েছে। দেওয়াসের প্রারম্ভিক সূচনা আমরা বৃজেশ কানুনগোর কাছে পেয়েছিলাম। তাঁর ঠিকানা - ১৫১ বিজয় নগর, দেওয়াস, মধ্যপ্রদেশ। সাগর শহর ও তার আশেপাশের এলাকায় যাতাযাতের ফলে সেখানের পুকুরগুলি সম্পর্কে অনেককিছুই দেখতে বুঝতে পারা গেছে। এছাড়াও শ্রী পঙ্কজ চতুর্বেদীর লেখা থেকেও সাহায্য পাওয়া গেছে।

মধ্যপ্রদেশের প্রায় দেড়শো শহরে ১৯৯৩ সালে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ থেকেই জলসঙ্কট শুরু হয়ে গিয়েছিলো এবং প্রশাসন এই শহরগুলিতে জল বয়ে আনার পরিকল্পনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

আমাদের রাজধানীও জলের ব্যপারে প্রতিদিনই গরীব প্রমানিত হয়ে চলেছে। যমুনা এবং এখন তো গঙ্গা থেকে বয়ে আনা জলও কম পড়ছে। দিল্লীর গ্রামগুলির জন্য হৈদরপুর জলকল কেন্দ্র, জলের অভাবে এপ্রিল ৯৩ পর্যন্ত শুরু করা যায়নি, সুধী পাঠকগন এটা খেয়াল করুন যে এটা সেই এলাকা, যেখানে মাত্র পঞ্চাশ ষাট বছর আগে পর্যন্তও পুকুর ও জলের কোন অভাব ছিলো না।

বইয়ের চতুর্থ সংস্করণ বেরোনো পর্যন্ত জল সংঙ্কট আরও বেড়েছে। সেই সঙ্গে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাগুলিতে সমস্যা সমাধানের চিন্তাও। সেন্টার ফর সায়েন্স এন্ড এনভারমেন্ট-এর মতো সংস্থাগুলি এখানে পুরোনো ও নতুন জল সংগ্রহ প্রণালীগুলির ওপর কাজ করছে। দিল্লীর গ্রাম্য এলাকায় উপেক্ষার ঝড়ের পরও যে পুকুরগুলি বেঁচে গেছে সেগুলি সংস্কারের কাজও শুরু হয়েছ।

মূল বইয়ের প্রথম সংস্করণ বেরোয় ১৯৯৩সালে এবং পঞ্চম সংস্করণ বেরোলো ২০০৪ সালে। এর মধ্যে মানুষজন জায়গায় জায়গায় পুকুর বাঁচানো এবং নতুন পুকুর তৈরীর কাজ শুরু করেছেন। এ তালিকাটা খুব ছোট নয়; তাই আমরা সেটা এখানে দিতে পারলাম না। এই প্রয়াস গুলিকে আমাদের সশ্রদ্ধ নমষ্কার। মনে হচ্ছে আমাদের মাথায় জমা পাঁক ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে চলেছে এবং রাজ্য ও সমাজ এটা ফিরে বুঝতে শুরু করেছেন যে আজও পুকুরগুলিই খাঁটি, আজও পুকুর আমাদের।

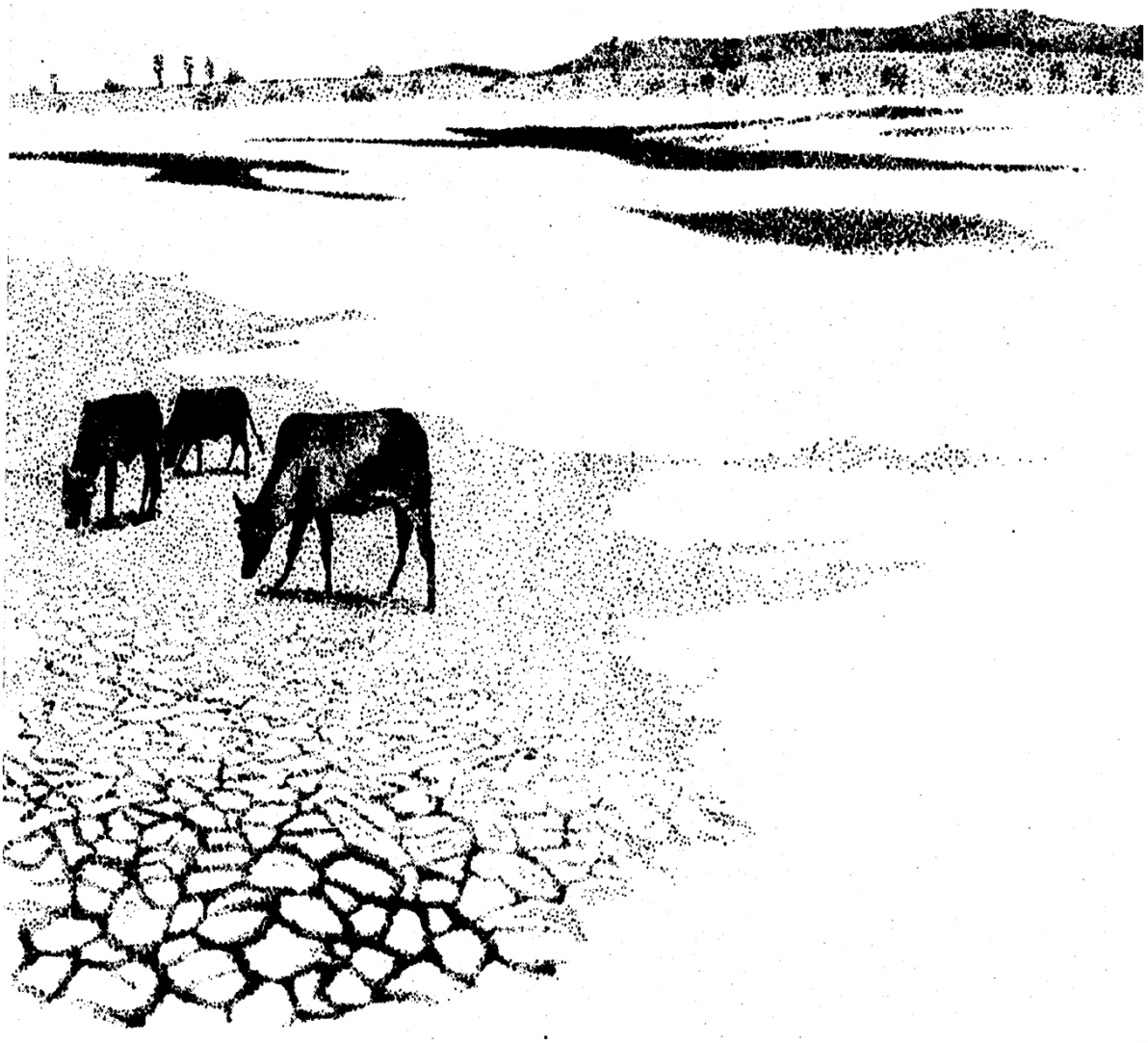

'অজ ভী খরে হ্যায় তালাব' বইটি পুকুর সম্বন্ধে আমাদের নতুন করে ভাবানোর, পুকুরকে নতুন করে জানানোর ভূমিকা নিয়েছে। ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় বইটি অনূদিত হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থা বার করেছে বিভিন্ন সংস্করণ। সম্প্রচারিত হয়েছে আকাশবাণীর এগারোটি কেন্দ্র থেকে। অল-ইন্ডিয়া রেডিও একটি সি ডি প্রস্তুত করেছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, পাঁচ হাজার পুকুর পুনরুদ্ধারের জন্য - কর্নাটক সরকারের একটি বিশেষ বিভাগ গঠন। এই আন্দোলনের যে তথ্যপঞ্জিটি হাতে এসে পৌঁছেচে তা হল —

ভারত জ্ঞান বিজ্ঞান পরিষদ, নতুন দিল্লী (সংক্ষিপ্ত সং) ১৯৯৫, ২৫০০০ কপি
অভিব্যক্তি, রাজ্য সংসাধন কেন্দ্রে, ভোপাল, মধ্যপ্রদেশ ১৯৯৯, ৫০০ কপি
মধ্যপ্রদেশ জন সংযোগ বিভাগ, ভোপাল, মধ্যপ্রদেশ ২০০১, ২৫০০০ কপি
স্বরাজ প্রকাশন সমূহ, নাগপুর, মহারাষ্ট্র ২০০৩, ৪০০০ কপি
উত্থান মাহিতি, অহমদাবাদ, গুজরাত ৫০০ কপি
বাণী প্রকাশন, নতুন দিল্লী ২০০৩, ১১০০ কপি
নঈ কিতাব, জামালপুর, বিহার ২০০৩, ১১০০ কপি

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ঃ

পাঞ্জাবী - শ্রী সুরেন্দ্র বানসাল, মালেরকোটলা, পাঞ্জাব
১ম সং - ২০০২, ৫০০কপি
২য় সং - ২০০৪, ২০০০কপি
বাংলা - নিরুপমা অধিকারী, পুরুলিয়া পঃ বঃ
১ম সং - ২০০২, ১০০০কপি
২য় সং - ২০০৫, ১০০০কপি
মারাঠী - সাকেত প্রকাশন, ঔরঙ্গাবাদ, মহারাষ্ট্র
১ম সং - ২০০৩, ১১০০কপি
অসমিয়া, ওড়িয়া, উর্দূ, কন্নড়, গুজরাতী, তামিল, তেলেগু, পাঞ্জাবী, বাংলা, মারাঠী, মালায়লম, হিন্দী এবং ইংরাজীতে, বার করার প্রস্তুতি নিয়েছে ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট, নতুন দিল্লী।